দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর—৫

Generated by CamScanner from intsig.com

স্মিত হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে ওঠে বনহুর—হ্যাঁ, আমি সন্ন্যাসী বাবাজী। মনিরা, তোমাকে নাথুরামের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আমার এ বেশ।

মনিরার হৃদয়ে অনাবিল এক আনন্দস্রোত বয়ে চলে। ঘন মেঘের অন্তরাল থেকে শশীকলা যেমন বিকাশ লাভ করে তেমনি মনিরার অশ্রুসিক্ত মলিন বিষণ্ন মুখে স্বর্গীয় এক হাসির আভা ফুটে ওঠে বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় বুকে। আবেগ ভরা মধুর কণ্ঠে ডাকে—মনিরা!

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে— যাও তুমি ভারী দুষ্ট।

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?

তুমি ভয় পাইয়ে দিলে পাব না? মনির, আজ আমার কি যে আনন্দ, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

দস্যু বনহুর আর মনিরা খাটের উপর গিয়ে পাশাপাশি বসে। কতদিন মনিরা বনহুরকে এমন পাশে পায় নি। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে সে তার মুখের দিকে।

বনহুর হেসে বলে— অমন করে কি দেখছ মনিরা।

তোমাকে। কতদিন তোমাকে দেখিনি মনির। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলে— একটিবার দেখাও করলে না আমার সঙ্গে।

উল্টো বলল মনিরা। দেখা করতে গিয়ে দেখা পাইনি। আম্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে চিনতেই পারেন নি। আমি পরিচয় দিয়েছিলাম— আমি তোমার সন্তান।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মনিরার মুখমণ্ডল দীপ্তকণ্ঠে বলে সত্যি?

হ্যাঁ।

কি আনন্দ মনির। আমার দেখা না পেলেও তুমি তোমার জননীর সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হয়েছ। তোমার জীবন সার্থক হয়েছে মনির।

হ্যাঁ মনিরা, আম্মাকে আমি সেদিন যেমন করে দেখেছিলাম আর কোনদিন বুঝি অমন করে দেখতে পাব না। কিন্তু জান মনিরা, তোমার জন্য আজ আমার আব্বা আম্মা কি অসহ্য ব্যথা পেয়েছেন?

জানি। কিন্তু মনিরা, লোকসমাজে আজ আমি হেয় হয়ে গেছি ----- বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার কণ্ঠ।

বনহুর মনিরার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে— আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি, সবাই জানে, তুমি আমার সঙ্গে চলে এসেছ। পুলিশমহল তাই তোমার সন্ধান করা ছেড়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, এ কথা আমিও মামা-মামীমার কাছে লিখেছিলাম।

তার মানে?

মনির, তুমি এখনও আমার অনেক কিছু জান না। সত্যি তুমি কত মহৎ! কত উন্নত! আমার সম্বন্ধে তোমার মনে এতটুকু সন্দেহের ছোঁয়াচ লাগেনি। কই, তুমিতো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে না?

তোমাকে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই আমি তোমার সম্বন্ধে সব অবগত হয়েছি। মনিরা, তোমার পবিত্র ভালবাসাই যে তার সাক্ষ্য।

Generated by CamScanner from intsig.com

অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে মনিরা— মনির! বনহুর ধীরে ধীরে মনিরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, মনিরা, চলো, এবার তোমাকে আব্বা আম্মার নিকটে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুখ তুলে মনিরা, দু'চোখে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বনহুর মনিরার চিবুক উঁচু করে ধরে বলে—কেন চোখের পানি ফেলছ। হাসো, হাসো মনিরা, তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমি দেখতে চাই। হাসো লক্ষ্মীটি।

মনিরার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বনহুর ওকে নিবিড় করে টেনে নেয় কাছে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—লক্ষ্মীটি আমার।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে নূরী। দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে ওর। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে—হুর।

বনহুর নূরীকে দেখেই চমকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছকণ্ঠে বলে নূরী এসো, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই।

নূরী স্থির চোখে তাকিয়ে আছে মনিরার দিকে।

মনিরাও নূরীকে দেখে কম আশ্চর্য হয় নি। সে একবার বনহুর আর এক বার নূরীর মুখের দিকে তাকায়। মনে তার অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে ধাক্কা মারে। কে এই যুবতী। বনহুরের সঙ্গে কি এর সম্বন্ধ!

বনহুর নূরী আর মনিরার মাঝখানে দাঁড়ায়, তারপর হেসে বলে— নূরী, এই সেই মনিরা— যার সন্ধানে আমি এবং আমার সমস্ত অনুচর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে নূরী—ব্যস্ত নয়, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলে।

তা তুমি যাই বল—শোনো মনিরা, এ হচ্ছে আমার ছোট বোন নূরী।

মিথ্যে কথা, আমি বোন নই।

অবাক হয়ে চোখ মেলে তাকায় মনিরা বনহুর আর নূরীর মুখের দিকে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তাহলে তুমি কে?

আমি তোমার আজন্ম সঙ্গিনী-সাথী। তুমি এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না হুর। শিশুকাল থেকে তোমাকে আমি দেখে আসছি। সব সময় তুমি আমার পাশে পাশে ছিলে।

তুমি যাই মনে কর নূরী, আমি তোমাকে বোনের মতই মনে করে এসেছি। বনহুর মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মনিরার মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

নূরী আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। দ্রুত বেরিয়ে যায় সেখান থেকে। কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। কিছুক্ষণ বনহুর আর মনিরা কোন কথাই বলতে পারে না।

নিস্তব্ধতা ভাঙে মনিরা, বলে— কি ভাবছ? আমি তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করতে পারব না।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় বুকে—মনিরা।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে অনেক বিশ্বাস করি। মনিরার কণ্ঠ স্বচ্ছ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

এখন বনহুর আর মনিরার যে পোড়োবাড়িতে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল, সে জায়গাটা বনহুরের আস্তানা ছেড়ে দূরে কান্দাইয়া গ্রামে।

একদিন এই কান্দাইয়া বিরাট একটা গ্রাম ছিল। বহু লোকের বাস ছিল এখানে। আজ কান্দাইয়া গ্রাম এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পে গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানে গহন বন। ভূমিকম্পের পর যে কয়েকজন লোক জীবিত ছিল, তারাও বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলো শহরে।

বহুকাল লোকজনের বসবাস না থাকায় কান্দাইয়া গ্রামের নাম কালক্রমে মানুষ সমাজ থেকে

Generated by CamScanner from intsig.com

গ্রাম পরিবেষ্টিত। কিন্তু প্রাচীন কোন কোন বৃদ্ধের মুখে এখনও এ গ্রামের নাম শোনা যায়। দস্যু বনহুর এই গ্রামের একটি পোড়োবাড়িতেই মনিরার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

অবশ্য এই পোড়োবাড়িতে মনিরা একা থাকত না। বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর মনিরার রক্ষণার্থে কড়া পাহারায় থাকত। এই তো মাত্র কয়েকদিন— মাঝে মাঝে বনহুরও গোপনে মনিরার সন্ধান নিয়ে যেত। মনিরাকে এখানে আটকে রাখার অবশ্য কারণ ছিল। বনহুর শয়তান নাথুরাম এবং মুরাদকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মনিরাকে তার মামা-মামীমার নিকট পৌঁছে দেবার পূর্বেই নূরী এই পোড়োবাড়ির সন্ধান জানতে পারে।

বনহুরের এক অনুচর গোপনে নূরীকে সংবাদ দেয়, তাদের সর্দার একটি যুবতীকে কান্দাইয়া বনের একটি পোড়োবাড়িতে আটকে রেখেছে। যুবতী অন্য কেউ নয়— চৌধুরী কন্যা মনিরা।

কথাটি শোনার পর থেকে নূরীর মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। নূরী যদিও হিংসাপরায়ণ নারী নয়, তবু তার মনে একটা দাহ শুরু হলো। মনিরাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল সে। নূরী সেই অনুচরটির সহায়তায় কান্দাইয়া বনে এসে পৌঁছল।

বনহুরের বাহুবন্ধনে মনিরা যখন ধরা পড়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নূরী কক্ষে প্রবেশ করে দৃশ্য দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে নূরীর স্বপ্নসৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে সেটা সহ্য করতে পারে না নূরী। পোড়োবাড়ি থেকে বেরিয়ে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বনহুরের সেই অনুচর জাফর অশ্ব নিয়ে নূরীর সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়ায়। বলে সে— এভাবে ছুটলে কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছবে? তার চেয়ে অশ্ব নিয়ে বাড়ি যাও।

নূরী কোনদিকে না তাকিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে।

জাফর জিজ্ঞাসা করে— কোথায় যাচ্ছো নূরী?

নূরী ততক্ষণে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। জাফরের কণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছল কিনা সন্দেহ। নূরীর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে অশ্ব নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। সামনে কোন বাধাই তাকে ক্ষান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না।

ঝোপঝাড়, লতাপাতা ডিঙিয়ে, গহন বনের মধ্য দিয়ে উল্কা বেগে ছুটে চলেছে নূরীর অশ্ব। বনহুরকে নূরী প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবাসে। শুধু ভালবাসে না, ওকে সে মনে প্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। নূরী দস্যু কন্যা— বনহুর দস্যু। বনহুর বীর পুরুষ, নূরী বীরাঙ্গনা। নূরী সুন্দরী, বনহুর সুপুরুষ— দু'য়ের মধ্যে সোনায় সোহাগায় মিল রয়েছে। অথচ বনহুর নূরী থেকে অনেক দূরে। বনহুরকে সে পাশে পেয়েছে বটে, কিন্তু কোথায় যেন অনেক তফাৎ রয়েছে তাদের মধ্যে।

বনহুর নূরীকে উপেক্ষা করলেও নূরী কোনদিন তাকে অবহেলা করতে পারেনি। বনহুরের উপেক্ষা তার হৃদয়ে আঘাত হেনেছে সত্য, কিন্তু রাগ বা অভিমান কিছুই করেনি সে।

বনহুরের কর্মক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেছে নূরী। হাসিভরা মুখে সে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে, কিন্তু আজ নূরী বনহুরকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। রাগে অভিমানে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার হৃদয়। বনহুর যে অন্য কোন নারীকে কোনদিন ভালবাসতে পারে, এ যেন তার কল্পনার বাইরে।

নূরীর অশ্ব উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। বন-প্রান্তর ছাড়িয়ে শহরের পথের ওপর এসে পড়ে নূরী।

পথ দিয়ে নূরী যখন অশ্ব চালিয়ে চলেছিল, তখন পথের দু'ধারে জনগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল। অন্যান্য যানবাহন বাধ্য হচ্ছিল নূরীকে পথ ছেড়ে দিতে। কে এ যুবতী— কোথায় চলেছে— কি এর উদ্দেশ্য, কেউ জানে না।

Generated by CamScanner from intsig.com

শেষ পর্যন্ত নূরীর অশ্ব একেবারে পুলিশ অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নূরী অশ্ব থেকে নেমে দ্রুত প্রবেশ করল।

মিঃ হারুন তখন কি একটা কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। মিঃ হোসেন নূরীকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলেন। কারণ, নূরীর বেশ স্বাভাবিক মেয়েদের মত নয়। তার পরনে ঘাগড়া, গায়ে কামিজ। একটা ওড়না মাথার উপর দিয়ে গলায় জড়ানো। লম্বা দুটো বিনুনী ঘাড়ের দু'পাশে ঝুলে রয়েছে। কতকটা ইরানী মেয়েদের মত তার শরীরের পোশাক।

মিঃ হোসেনকে দেখে নূরী প্রথমে থমকে দাঁড়ায়। ভয়ও পায় সে। হঠাৎ কি বলবে ভেবে পায় না। নূরী পুলিশের লোককে তেমন করে দেখেনি কোনদিন। তা ছাড়া পুলিশের ড্রেস নূরীর চক্ষুশূল। অবশ্য এর কারণ আছে। সে দস্যুকন্যা— পুলিশকে তাই সে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করতে পারে না।

মিঃ হোসেন জিজ্ঞাসা করেন— কে তুমি? কি চাও?

মিঃ হোসেনের কথায় চোখ তুলে তাকান মিঃ হারুন। নূরীকে দেখে তিনিও অবাক হন। প্রশ্নভরা চোখে তাকান তিনি নূরীর দিকে।

নূরী একটা ঢোক গিলে বলে—ইন্সপেক্টার সাহেব, আমার সঙ্গে আসুন—শীঘ্র আসুন, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে আপনাদের সাহায্য করব।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন মিঃ হোসেন এবং মিঃ হারুন—দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ। স্তব্ধ কণ্ঠে বলে নূরী।

পুলিশ অফিসের সমস্ত লোক থ'হয়ে যায়। সকলেরই চোখে মুখে একটা আতঙ্কভাব ফুটে ওঠে।

এগিয়ে আসেন মিঃ হারুন— তুমি কে যুবতী? তোমার পরিচয়?

নূরী ইতস্তত করে বলে— আমাকে দস্যু বনহুর ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি। আপনারা আর বিলম্ব করবেন না। তাড়াতাড়ি চলুন, সেখানে আর একটি মেয়েকেও উদ্ধার করতে পারবেন।

মিঃ হারুন মিঃ হোসেনকে নির্দেশ দিলেন অতি শীঘ্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে তৈরি হতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন তাঁর দলবল এবং পুলিশ ফোর্স নিয়ে কান্দাইয়া বনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনের মধ্যে কয়েকটা কথাবার্তা হলো। মিঃ হোসেন বললেন— সেখানে যে যুবতী রয়েছে, সেই যে চৌধুরীকন্যা মিস মনিরা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হারুন বললেন— আজ যদি আমরা ঠিকভাবে সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হই, তাহলে এক ঢিলে দু'পাখি মারা হবে। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা হবে এবং চৌধুরী সাহেবের ভাগনী মিস মনিরাকে উদ্ধার করাও হবে।

নূরী নিজের অশ্ব চেপে পুলিশগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যদিও তার হৃদয়ে ঝড় বইছে তবু সে এতটুকু বিচলিত হলো না।

মিঃ হারুন দলবল নিয়ে অতি সাবধানে চলতে লাগলেন। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা সহজ কথা নয়। কৌশলে তাকে বন্দী করতে হবে।

এক সময় তারা কান্দাইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গহন বন। ঘন অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন। হিংস্র জন্তুর কবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল পুলিশ ফোর্স।

Generated by CamScanner from intsig.com

মনিরা বীণা বাজিয়ে চলেছে। তার বীণার অপূর্ব ঝঙ্কারে গোটা বনভূমি মোহিত হয়ে উঠেছে। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুর মনিরার মুখের দিকে। অর্ধ শায়িত অবস্থায় শুয়ে আছে বনহুর। মনিরার বীণার সুর তার হৃদয়ে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। সে এক স্বপ্নময় রাজ্যে চলে গিয়েছে। সেখানে শুধু সে আর মনিরা।

মনিরাকে তার মামা-মামীর নিকট পৌঁছে দেবার পূর্বে বনহুর একবার ওর হাতে বীণা বাজানো শুনতে চেয়েছিল। মনিরা ওর এ অনুরোধ অবহেলা করতে পারেনি।

মনিরা আজ তার অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বীণার ঝঙ্কার তুলেছিল। মনের গোপন কথা সে ব্যক্ত করছিল বীণার সুরে সুরে।

বনহুরের গভীর নীল দু'টি নয়নে মায়াময় চাহনি। নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল মনিরাকে।

হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে নূরী, পেছনে উদ্যত রিভলভার হাতে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন। তারও প্রবেশ করে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ। সকলেরই হাতে উদ্যত রাইফেল।

বনহুর দ্রুত সোজা হয়ে বসে।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরার হাতে বীণার সুর থেমে যায়।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন বনহুরের দুই পাশে গিয়ে দাঁড়ান, রিভলভার উদ্যত করে বলেন— হ্যান্ডস আপ।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী রাইফেল উদ্যত করে দস্যু বনহুরকে ঘিরে ধরেছে।

বনহুর একবার তাকাল নূরীর মুখের দিকে। তারপর তাকাল মিঃ হারুন আর মিঃ হোসেনের দিকে।

মনিরার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। সে তাকিয়ে দেখল বনহুরের মুখে এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। পূর্বের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত তার মুখোভাব। এতটুকু বিচলিত হয় নি সে।

আচমকা এ অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বনহুর। নইলে পুলিশ ফোর্সের সাধ্য কি তাকে গ্রেফতার করে? নিরস্ত্র বনহুর— কিন্তু সে অসহায় নয়।

মিঃ হারুনের ইংগিতে মিঃ হোসেন বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

বনহুরের হাতে যখন মিঃ হোসেন হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলে। হৃদয়টা যেন ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিল, ওর আংগুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, সকলের অজ্ঞাতে। পেছন থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সে।

চারদিকে ঘিরে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হাতে বনহুরকে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

মিঃ হারুন মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন চলুন আপনার মামা মামীর নিকটে পৌঁছে দিই।

মনিরার চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব ফুটে উঠেছিল। এতক্ষণ সে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে সব দেখছিল। মিঃ হারুনের কথায় চমক ভাঙে। একবার নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মিঃ হারুনকে অনুসরণ করে।

সবাই কক্ষ ত্যাগ করতেই আড়ালে দাঁড়িয়ে নূরী উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভাবে, একি করল। রাগের বশে একি করল সে, দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে থাকে সে।

নূরী কৌশলে বনহুরের পাহারাদারগণকে সরিয়ে ফেলেছিল। নইলে তারা এত সহজে

Generated by CamScanner from intsig.com

পুলিশকে পোড়োবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে দিত না।

বনহুরকে নিয়ে পুলিশবাহিনী এক সময় পোড়োবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের পাহারাদারগণ উপস্থিত হলো সেখানে। সংখ্যায় তারা অতিঅল্প— তবু আক্রমণ করল পুলিশবাহিনীকে।

দু'দিক থেকে চলল গুলী বিনিময়।

অসংখ্য পুলিশফোর্সের সাথে মাত্র কয়েকজন দস্যুর পেরে ওঠা অসম্ভব। বনহুরের অনুচর কয়েকজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিহত হলো। একজন আত্মগোপন করে ছুটলো বনহুরের আস্তানার দিকে—রহমানকে খবরটা জানাতে।

দস্যুগণের গুলীতেও কয়েকজন পুলিশ নিহত হলো এবং মিঃ হোসেনের দক্ষিণ হাতখানা গুরুতর আহত হলো।

এবার পুলিশ ফোর্স বনহুরকে নিয়ে বন পেরিয়ে একটা ফাঁকা স্থানে এসে পৌছল। সেখানেই অপেক্ষা করছিল পুলিশ ভ্যানগুলো।

পাঁচখানা গাড়ি সেখানে প্রস্তুত ছিল।

সম্মুখে এবং পেছনে দু'খানা করে পুলিশ ভ্যান। প্রত্যেকটা গাড়িতে দশজন করে পুলিশ দাঁড়িয়ে রইলো উদ্যত রাইফেল হাতে।

মাঝখানের গাড়িতে মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন, মনিরা এবং দস্যু বনহুর রয়েছে।

মিঃ হোসেনের দক্ষিণ হাতে গুলী বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সামনের আসনে অতি কষ্টে বসে রইলেন, প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতই হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পেছনের আসনে দস্যু বনহুর—হাতে তার হাতকড়া, পাশেই উদ্যত রিভলভার হাতে মিঃ হারুন।

পাঁচখানা গাড়ি একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। যেন বিশ্ব বিজয় করে তারা ফিরে চলেছে।

মিঃ হারুনের মনে অফুরন্ত আনন্দ। যে দস্যুকে গ্রেফতার করার জন্য অহরহ পুলিশবাহিনী উম্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করছে—পুলিশ সুপার নিজে যাকে গ্রেফতারের জন্য কাজে নেমে পড়েছিলেন সেই দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে নিয়ে চলেছেন তিনি! দুনিয়া জয়ের আনন্দ আজ তাঁর মনে।

❑

জনহীন পথ।

দু'ধারে শাল আর সেগুন গাছের সারি। পথের পাশে মাঝে মাঝে ঘন বনও রয়েছে। প্রায় মাইল দশেক চলার পর তারা শহরে গিয়ে পৌছবে।

এই দশ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

মাঝে মাঝে দু'একটা পথ বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে এদিকে সেদিকে। হয়ত দূর-দূরান্তে কোন গ্রামের দিকে।

দস্যু বনহুর নিশ্চুপ বসে রয়েছে। হাতে তার হাতকড়া পরানো, মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ললাটের চারপাশে। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে সে গাড়ির বাইরের দিকে। কে বলবে সে দস্যু, অতি ভদ্রজনের মত নিশ্চুপ বসে আছে!

মনিরা মিঃ হারুনের পাশে জড়োসড়ো হয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মুখোভাব আর

Generated by CamScanner from intsig.com

নয়। মনের দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে তার মুখে।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে মনিরা।

হঠাৎ বনহুরের কণ্ঠস্বরে মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরে তাকায় সে।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—খবরদার! একটু নড়লে কিংবা চিৎকার করলে

রবেন

মনিরা দেখল, বনহুর হাতকড়া পরা হাতেই মিঃ হারুনের পাঁজরে রিভলভার চেপে ধরেছে। কখন যে অতর্কিতভাবে সে মিঃ হারুনের হাত থেকে রিভলভারখানা কেড়ে নিয়েছিল কেউ টের পায় নি। সে আরও দেখল, মিঃ হারুনের চোখেমুখে উৎকণ্ঠতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি না পারছেন নড়তে, না পারছেন চিৎকার করতে। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুরের কণ্ঠস্বরে ড্রাইভারও ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল। মুহূর্তে তার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করল। দস্যু বনহুরের হাতে রিভলভার, এ কম কথা নয়। ভয়কম্পিত হাতে গাড়ি চালাতে লাগল সে। তার মুখ দিয়েও চিৎকার বের হলো না। হঠাৎ যদি দস্যু তার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। তাই সে নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলল।

বনহুর পূর্বের ন্যায় কঠিন চাপা কণ্ঠে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল– ড্রাইভার সামনে বাম দিকে যে পথটা গেছে সেই পথে গাড়ি নাও– নইলে মৃত্যু।

মনিরা তাকালো সম্মুখে। ঐ তো একটু সামনেই আর একটা পথ বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে চলে গেছে বামদিকে। সরু পথটার দু'ধারে ঘন বন।

মনিরা নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে দেখল, তাদের গাড়ির আগের দু'খানা গাড়ি সোজা চলে গেল– সঙ্গে সঙ্গে তাদের গাড়ি থেমে পড়লো সরু রাস্তায়। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড– পেছনের গাড়ি দু'খানা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বনহুরের গাড়িখানা তখন সাঁ সাঁ করে ঢালু রাস্তায় নেমে যাচ্ছে।

বনহুর তখনও রিভলভার মিঃ হারুনের বুকে চেপে ধরে আছে। পেছনের গাড়ি দু'খানা থেমে হুইসেল দিতেই সামনের গাড়ি দু'টিও থেমে পড়ে এবং অতি দ্রুত বনহুরের গাড়িখানাকে অনুসরণ করে। এক সঙ্গে চারটি পুলিশ ভ্যান ছুটলো। সামনের গাড়িটাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলী ছুড়তে সাহসী হলো না। কারণ, গাড়িতে রয়েছে দু'জন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং চৌধুরী সাহেবের ভাগনী মিস মনিরা।

সামনের গাড়িখানা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

মিঃ হারুন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করছেন। মিঃ হোসেনের অবস্থা শোচনীয়। দক্ষিণ হাতখানা গুলীর আঘাতে ঝুলে পড়েছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে– তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ক্রমে যেন তাঁর জ্ঞান লোপ পাচ্ছে।

ড্রাইভারের হৃদকম্পন শুরু হয়েছে। সে কোনরকমে গাড়ির গতি ঠিক রেখে গাড়ি চালাচ্ছে। কোন মুহূর্তে বনহুরের গুলী তার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে বেরিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

মনিরার অবস্থা অবর্ণনীয়। কোন্ সময়ে যে গাড়িখানা উল্টে যাবে। এখন পথের একধারে গভীর খাদ, আরেক ধারে গহন বন। নিজের জন্য চিন্তা করে না মনিরা—ভয় বনহুরের জন্য।

কিন্তু বনহুরের তখন কিছু ভাববার সময় নেই। দস্যু মনোবৃত্তি জেগে উঠেছে তার অন্তরে।

হঠাৎ গাড়িখানা আচমকা থেমে যায়।

মনিরা তাকিয়ে দেখে মিঃ হারুনের পাশে বনহুর নেই। পাশের জঙ্গলের কিছুটা শুধু নড়ে ওঠে একবার।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হারুনের কণ্ঠ তার কানে এসে পৌঁছে— দস্যু বনহুর পালিয়েছে। দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

পেছনে অসংখ্য রাইফেল একসঙ্গে গর্জে ওঠে।

Generated by CamScanner from intsig.com

মনিরা তাকিয়ে দেখল, পেছনে চারখানা পুলিশ ভ্যান সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবগুলো ভ্যান থেকে পুলিশবাহিনী রাইফেল উদ্যত করে তীরবেগে ছুটে আসছে।

মনিরার হৃদপিণ্ড ধক্ ধক্ করে ওঠে। দুর্ভাবনায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। না জানি বনহুরকে ওরা আবার ধরে ফেলবে কিংবা হত্যা করে ফেলবে।

পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করে মিঃ হারুন আদেশ দিলেন গোটা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে। দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করে নিয়ে যেতেই হবে। নিজেও মিঃ হোসেনের রিভলবার নিয়ে নেমে পড়লেন।

কিন্তু কোথায় বনহুর। খুঁজে হয়রান-পেরেশান হয়ে পড়লেন মিঃ হারুন এবং তাঁর দলবল। এদিকে বেশি দেরী করাও চলে না, কারণ মিঃ হোসেনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। শীঘ্র তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন।

কাজেই বিলম্ব করা আর মোটেই উচিত নয়।

❏

মনিরাকে নিয়ে মিঃ হারুন যখন চৌধুরী বাড়ি পৌঁছলেন, তখন রাত প্রায় বারোটা বেজে গেছে। দু'জন পুলিশসহ মনিরাকে নিয়ে তিনি হাজির হলেন।

ওদিকে মিঃ হোসেনের চিকিৎসার জন্য তাঁকে পুলিশ হসপিটালে পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশদের ক্যাপ্টেনকে বলে দিলেন তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা যেন তিনি করেন।

চৌধুরী সাহেব সবেমাত্র শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বয় ছুটে আসে– স্যার, আপামণি এসেছেন। আর তার সঙ্গে এসেছেন ইন্সপেক্টার সাহেব।

কথাটা কানে যেতেই চৌধুরী সাহেব কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি চঞ্চল কণ্ঠে বললেন— কোথায় সে? ওগো, যাও না– মা– মণি এসেছে।

শুনেছি কিন্তু–

না, না, কিন্তু নয়, যাও; দেখ একবার। ওরে বাবলু যা, ওকে আমার কাছে ডেকে আন।

বাবুল ছুটলো নিচে।

মরিয়ম বেগম স্বামীর হাত ধরে টেনে তুলে দিলেন— যাও তুমি।

চৌধুরী সাহেব অগ্যাতা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। মনিরা এবং মিঃ হারুন হলঘরের মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চৌধুরী সাহেবকে দেখে মিঃ হারুন বললেন– গুড নাইট চৌধুরী সাহেব। এই নিন আপনার ভাগ্নী মিস মনিরা।

চৌধুরী সাহেব ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন মনিরার দিকে, কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন—বসুন।

মিঃ হারুন বললেন– না চৌধুরী সাহেব, আজ আর বসব না। আপনার গুণধর পুত্র আমাদের সবাইকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে—কথা শেষ না করেই দ্রুত বেরিয়ে যান তিনি।

চৌধুরী সাহেব আর দাঁড়ান না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যান।

কখন যে মরিয়ম বেগম সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে যায়। তারপর নিচে নেমে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন মনিরাকে–মা! কোথায় গিয়েছিলি তুই?

মনিরা মামীকে আঁকড়ে ধরে আকুলভাবে কেঁদে ওঠে। এতদিনের রুদ্ধ কান্না বাঁধ-ভাঙা জোয়ারের পানির মত বেরিয়ে আসে।

মরিয়ম বেগম কন্যা-সমতুল্য মনিরার চোখের পানি সহ্য করতে পারেন না। তিনিও নীরবে

Generated by CamScanner from intsig.com

...বিসর্জন করেন। তারপর মনিরাকে নিয়ে উঠে আসেন উপরে।

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মরিয়ম বেগম— ...দের না বলে অমন করে কেন চলে গিয়েছিলি মা? তোর মামা-মামীর কথা একটুও ভাবিসনি? ...কেঁদে আমরা অন্ধ হয়ে গিয়েছি?

মনিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, মামীমা! আমার কোন দোষ নেই।

তা জানি, সব জানি। ঐ হতভাগ্য নিজেও মরেছে, তোরও সর্বনাশ করেছে। ওর কোন মঙ্গল হবে না।

না, না, তুমি ওকে অভিসম্পাদ কর না মামীমা। তুমি ওকে অভিসম্পাত কর না। ওর কোন অপরাধ নেই। তোমার মনির অতি মহান!

মনিরা।

হ্যাঁ মামীমা, আমাকে সে নিয়ে যায়নি, বা আমি নিজেও তার সাথে যাইনি।

তবে? তবে যে তোর চিঠি।

ও চিঠি আমার নয় মামীমা।

কি বললি, ও চিঠি তোর নয়?

আমার হাতের লেখা, কিন্তু আমার কথা নয়।

এ তুই কি বলছিস মনিরা?

হ্যাঁ মামীমা, ও চিঠি আমাকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়েছে।

কে—ঐ পাঁজি মনিরটা বুঝি?

না। সে অন্য এক শয়তান।

কে? সে কে মনিরা?

যারা আমাকে সেদিন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার নাম শয়তান মুরাদ– তোমাদের সেই জামাতা।

খান বাহাদুরের ছেলে মুরাদ?

হ্যাঁ।

তাই তো বলি এতবড় সর্বনাশ আমার মনির করবে! দাঁড়া— এক্ষুণি তোর মামাকে সব বলি।

না, না, মামীমা এসব তুমি আর কারও কাছে বল না, এতে আমার কলঙ্ক বাড়বে। সবাই জানে আমি তোমাদের সন্তান দস্যু বনহুরের সঙ্গে গিয়েছি। তাই জানুক– সে কলঙ্ক হবে আমার অঙ্গের ভূষণ।

মনির এ কথা যদি জানতে পারে—তোকে অন্য একজন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল?

সে সব জানে। তোমাদের কোন ভয় নেই মামীমা। সেই তো আমাকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

সত্যি!

সব সত্যি। মামীমা, আমায় কিছু খেতে দাও। তারপর তোমার বিছানায় শুয়ে সব বলছি।

মরিয়ম বেগম তাড়াতাড়ি ঘরে যা ছিল এনে মনিরাকে খেতে দিলেন।

মনিরা খেতে খেতে বলল—কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি।

খাওয়া শেষ করে মামীমার পাশে শুয়ে সমস্ত কথা এক এক বলে গেল মনিরা।

Generated by CamScanner from intsig.com

❑

পুলিশ ভ্যানগুলো দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বনহুর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে — হাঃ হাঃ হাঃ–

সে হাসির প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ বনভূমি প্রকম্পিত করে তোলে। গাছের পাতাগুলো যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। পাখিগুলো উড়ে উঠে আকাশে।

বনহুরের হাতে তখনও হাতকড়া পরানো। দক্ষিণ হাতে মিঃ হারুনের সেই রিভলবারখানা ধরা রয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হিংস্র জন্তু যেমন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে, তেমনি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে দস্যু বনহুর!

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে।

বনহুর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকায় চারদিকে। এখন যে কোন উপায়ে প্রথম তাকে হাত দু'খানা মুক্ত করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

মাথা নিচু করে ভাবছে, এমন সময় তার কানে ভেসে আসে অশ্ব পদশব্দ। চমকে ফিরে তাকায় বনহুর। দেখতে পায়, যে পথের ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে সেই পথ বেয়ে একজন অশ্বারোহী দ্রুত এগিয়ে আসছে।

বনহুর চট করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে অশ্বারোহী ক্রমান্বয়ে পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে, বড় রাস্তার দিকেই যাবে সে।

অশ্বারোহী নিকটবর্তী হতেই বনহুর সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে দেখল, অশ্বারোহীর পিঠে একটা বন্দুক বাঁধা রয়েছে। লোকটার শরীরে শিকারীর ড্রেস। কয়েকটা পাখিও ঝুলছে অশ্বের সম্মুখ ভাগে। বিভীষিকাময় রাত্রির আগমন আশঙ্কায় অশ্বারোহী দ্রুত অশ্ব চালনা করছিল।

বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যে কোন উপায়ে এই অশ্বারোহীকে রুখতে হবে।

শিকারী অতি নিকটে পৌঁছে গেছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে বনহুর। অশ্বারোহী তার সম্মুখে আসতেই বনহুর রিভলভার উঁচু করে ধরে চিৎকার করে ওঠে– থামো।

সম্মুখে ভূত দেখার মত চমকে উঠে অশ্বারোহী। ভয়ে থর থর করে কেঁপে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড। বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর মুখমণ্ডল। অশ্বের লাগাম টেনে ধরে অশ্ব থামিয়ে ফেলে।

বনহুর রিভলভার উদ্যত করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—ভয় নেই, আমি তোমাকে হত্যা করব না।

শিকারীর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বনহুরের হাতে হাতকড়া লাগানো দেখেই বুঝতে পারে—এ লোকটি নিশ্চয়ই কোন পলাতক আসামী।

কিন্তু বনহুর শিকারীকে বন্দুকে হাত দিতে দেয় না। বলে ওঠে খবরদার! ওটাতে হাত দিয়েছ কি মরেছ?

অগত্যা শিকারী ফ্যাকাশে মুখে বলে ওঠে—তুমি কি চাও? আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।

টাকা পয়সা আমি চাই না—চাই তোমার অশ্ব।

অশ্ব!

হ্যাঁ। কিন্তু একেবারে চাই না—আবার তুমি ফেরত পাবে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে শিকারী –তাহলে আমার ব্যবস্থা কি হবে?

তুমি যদি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার কর, তাহলে কথা শেষ না করেই বনহুর দ্রুত প একটা টিলার মত উঁচু জায়গায় উঠে লাফিয়ে পড়ল অশ্বের পিঠে শিকারীর পেছনে। রিভলভার শিকারীর পিঠে চেপে ধরে— চালাও।

অশ্ব আবার ছুটতে শুরু করে।

Generated by CamScanner from intsig.com

সরু রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো তারা।

সম্মুখে ভয়বিহবল শিকারী পেছনে দুর্ধর্ষ, দস্যু বনহুর।

প্রায় ঘণ্টা কয়েক চলার পর একটি পল্লীর নিকটে এসে পৌঁছল ওরা। এবার বনহুর শিকারীর পিঠ থেকে বন্দুকখানা খুলে নিয়ে সামনের জলাশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল। তারপর ওকে অশ্ব থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল– আগামীকাল তুমি এই স্থানে অপেক্ষা করবে, আমি তোমার অশ্ব ফেরত দেব। কিন্তু মনে রেখ, কোনরকম চালাকি করতে গেলে মরবে। আমি ক্ষমা করব না।

শিকারী স্তব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

বনহুর একটু হেসে জবাব দিল— দস্যু বনহুর।

শিকারী চমকে দু'পা পিছিয়ে গেল, তার কণ্ঠ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের হলো—দস্যু বনহুর!

বনহুর ততক্ষণে অশ্ব ছুটিয়ে চলেছে।

শিকারীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

বনহুর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই শিকারী ভদ্রলোক ছুটল লোকালয়ের উদ্দেশ্যে। যে দস্যু বনহুরের ভয়ে আজ দেশময় ত্রাহি ত্রাহি ভাব, সেই সেই দস্যু বনহুর আজ তাকে স্পর্শ করে গেল এমনকি একই অশ্বে এতদূর এসেছে তারা দু'জনে।

শিকারী যখন লোকালয়ে পৌঁছে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, তখন দস্যু বনহুর এক কর্মকারের বাড়ির দরজায় গিয়ে নেমে দাঁড়াল।

গভীর রাত। সবাই ঘুমে অচেতন।

কর্মকার সারাদিনে ক্লান্তির পর ছেড়া কাঁথার নিচে গা মুড়ি দিয়ে সুখনিদ্রা উপভোগ করছে।

এমন সময় বনহুর তার পাশে এসে দাঁড়াল। রিভলভারের ডগা দিয়ে মুখের কাঁথা সরিয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মকারের সুখনিদ্রা ছুটে গেল, চোখ মেলে তাকিয়ে অপরিচিত এক ব্যক্তিকে তার কক্ষে দেখে ত্বরিতগতিতে বিছানায় ওঠে বসল।

কর্মকার কিছু বলার পূর্বেই বনহুর রিভলভার উঁচু করে ধরল।

কর্মকার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে কিছু বুঝতে না পেরে হা করে তাকিয়ে রইল। ভাবল, স্বপ্ন দেখছে না তো– দু'হাতে চোখ রগড়ে ভাল করে তাকাল।

বনহুর বলে উঠল–ওঠো।

কর্মকার চিত্রার্পিতের ন্যায় উঠে দাঁড়াল। বারবার তাকাতে লাগল বনহুরের হাতের রিভলভারখানার দিকে।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বলল—এই যে– আমার এ দুটো খুলে দাও।

কর্মকার এতক্ষণে বনহুরের হাতের হাতকড়ার দিকে নজর করেনি। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। ভাবলো নিশ্চয়ই এ ভাল লোক নয়, কোন কয়েদী, পালিয়ে এসেছে তার কাছে।

কর্মকারের দু'চোখ গোলাকার হয়ে ওঠে। সে জানে পলাতক কয়েদী ধরে দিলে পুরস্কার পাওয়া যায়। হয়তো কোন চোর কিংবা ডাকু হবে। মোটা পুরস্কার পাবে সে। তার মুখটা হাসিমাখা করে বলল, কে তুমি বাবা?

বনহুর কর্মকারের মুখোভাব দেখে তার মনের ভাব বুঝেছিল, হেসে বলল— আমি একজন পলাতক আসামী। দেখো ভাই, আমার হাতের এ দুটো খুলে দাও। আর একটু থাকার জায়গা যদি দিতে।

তা আর বলতে হবে না। আমরা হিন্দু, অতিথি আমাদের কাছে দেবতার সমান।

Generated by CamScanner from intsig.com

বেশ, তাহলে আমার হাতের ঐ দুটো খুলে দাও।

বনহুর কর্মকারের বুকের কাছ থেকে রিভলভারখানা সরিয়ে নিয়েছিল। কর্মকার বনহুরকে নিয়ে তার কারখানার মধ্যে প্রবেশ করল কিছুক্ষণ পরিশ্রম কারার পর বনহুরের হাত দু'খানা মুক্ত হয়ে যায়।

হাত দু'খানাতে হাত বুলিয়ে বলে বনহুর—এর জন্য তুমি পুরস্কার পাবে। এবার আমার শোবার জায়গা করে দাও দেখি।

কর্মকারের আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে বলে—হাতকড়া খুলে দিয়েছি বলেই তোমাকে ছাড়ছিনে বাছাধন। কিন্তু প্রকাশ্যে বলে—এসো বাবা এসো, এই যে আমার বিছানায় শোও, আমি ভিতরে শুতে যাই।

আচ্ছা। বনহুর কর্মকারের তেলচিটে বিছানায় শুয়ে কাঁথাটা টেনে দিল চোখেমুখে। তারপর কাঁথার নিচে থেকে হাই তুলে বলল—তুমি যাও, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।

কর্মকার বেরিয়ে যাবার পূর্বে আর একবার বলে—তুমি বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোও। কাল ভোরে ডেকে দেব।

বনহুর কাঁথার নিচে থেকে বলে—আচ্ছা।

কর্মকার বেরিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। বনহুর শুনতে পেল শিকলটাও আটকে দিল সে।

দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁথা সরিয়ে দরজার পাশে এসে কান পেতে শুনতে লাগল বনহুর।

ওপাশ থেকে ভেসে আসছে কর্মকারের চাপা কণ্ঠস্বর-ওগো, ওঠো-ওঠো!

মেয়েলী কণ্ঠ - বলি এত রাতে কি হলো তোমার?

শোনো, একটা কয়েদী পালিয়ে এসেছে।

তাতে আমার কি?

তোমার কি, শোনোই না! ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে কি পাব জান?

কি পাবে?

গভর্নমেন্ট আমাকে মোটা পুরস্কার দেবে। অনেক টাকা— বুঝেছ?

বুঝেছি, কিন্তু কয়েদী কোথায়?

ঐ যে আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে। আমার নরম বিছানায়, গরম কাঁথার নিচে ঐ শোনো নাক ডাকছে। দেখো, তুমি চুপ করে এই দরজার পাশে থাক। আমি চট করে থানায় খবরটা দিয়ে আসি।

সে কি গো! খবরটা দিয়ে আসবে, না পুলিশ নিয়ে আসবে?

হাঁ, পুলিশকে একেবারে সংগে করে নিয়ে আসব। তুমি এখান থেকে নড়ো না, বুঝেছ?

হাঁ গো বুঝেছি। যাও, চট করে এসো কিন্তু। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আরে রেখে দাও তোমার ঘুম, দেখো দরজা যেন আবার খুলে দিও না।

না গো না, দেব না—দেব না।

চটি জুতা পায়ে বেরিয়ে যাবার শব্দ শোনা যায়।

বনহুর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে।

একটা কাগজে নিজের নাম লিখল বনহুর। তারপর বিছানার ওপর রেখে পেছনের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার সরু শিকগুলোতে হাত দিয়ে মৃদু হাসলো সে। মাত্র কয়েক মিনিট—বনহুর জানালা দিয়ে ঘরের পেছনে বেরিয়ে এলো। অদূরে অশ্বটা ঘাস চিবুচ্ছিল। বনহুর

Generated by CamScanner from intsig.com

বিলম্ব না করে অশ্বে চেপে বসল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অঞ্চলের থানার ছোট দারোগা মিঃ হাকিম আর কয়েকজন পুলিশ কর্মকারের সংগে এসে হাজির হলেন।

কর্মকার এসে দেখে তার বৌ দরজার পাশে আঁচল বিছিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমাচ্ছে।

দারোগা সাহেবকে বলল কর্মকার—হুজুর এই ঘরে কয়েদীকে আটকে রেখেছি। আমার কাছ থেকে পালাবে এমন বেটা আছে নাকি? দাঁড়ান, দরজা খুলে দিই। কর্মকার নিজ হাতে দরজা খুলে ফেলল।

দারোগা, জমাদার এবং পুলিশ একসংগে কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু একি, কোথায় কয়েদী! শূন্য বিছানা পড়ে রয়েছে।

ছোট দারোগা মিঃ হাকিম ধমক দিলেন—কোথায় কয়েদী? পাঁজি কোথাকার। জানিস মিথ্যে বলার শাস্তি কি?

কর্মকার কাঁপতে কাঁপতে বলল— হুজুর মিথ্যে বলিনি। আমরা হিন্দু, এই যেন কান ধরে বলি.........

কর্মকারের কথা শেষ হয় না। একজন পুলিশ উবু হয়ে বিছানা থেকে কাগজখণ্ড তুলে নিয়ে লণ্ঠনের সম্মুখে ধরে চিৎকার করে উঠলেন— দস্যু বনহুর!

মিঃ হাকিম অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠেন—কোথায় দস্যু বনহুর?

এই দেখুন স্যার। জমাদার সাহেব কাগজের টুকরাখানা এগিয়ে দেন মিঃ হাকিমের দিকে।

কাগজখানা নিয়ে পড়ে দেখলেন তিনি, তারপর একটা শব্দ করলেন–আশ্চর্য, দস্যু বনহুর এসেছিল এখানে।

কর্মকার তখন কাঁপতে শুরু করেছে। দস্যু বনহুরের হাতের হাতকড়া সে নিজ হাতে খুলে দিয়েছে, এও কি সত্য?

তাকে আবার বন্দীও করে রেখে গিয়েছিল সে। কি সর্বনাশটাই না করেছি। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাকে ক্ষমা করবে না। হয়তো তাকে হত্যাও করতে পারে। কর্মকার কেঁদেই ফেলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ভিড় জমে গেল।

মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল, কর্মকার জয়নাথ দস্যু বনহুরকে আটকে রেখেছিল—এ কম কথা নয়।

ওদিকে শিকারী গ্রামের কয়েকজন লোককে সংগে করে শহরে গিয়ে পৌঁছল। সোজা গেল সে পুলিশ অফিসে।

সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের কাছে। আগামী রাতে সেই স্থানে তার অশ্বটি ফেরত দিতে আসবে দস্যু বনহুর—এ কথাও বলতে ভুলল না।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন সব শুনে বুঝতে পারলেন, কাল তারা যখন দস্যু বনহুরকে খুঁজে না পেয়ে চলে এসেছিলেন, ঠিক তার পরপরই ঐ শিকারী ভদ্রলোক অশ্ব ছুটিয়ে সেই পথে আসছিল এবং তারপর এসব ঘটনা সেখানে ঘটছে।

গোপনে মিঃ হারুন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের নতুন ফন্দি আঁটলেন।

যে স্থানে অশ্বটি ফেরত দেবার কথা আছে সেই জায়গায় এক গোপন স্থানে কিছুসংখ্যক পুলিশ লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন, শিকারীও অশ্ব ফেরত নেয়ার জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে।

পুলিশমহল যখন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে কর্মকারসহ মিঃ হাকিম এসে হাজির হলেন পুলিশ অফিসে।

গত রাতের ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন— কর্মকারের মুখেও সব শুনলেন মিঃ হারুন।

Generated by CamScanner from intsig.com

দস্যু বনহুর স্বয়ং কর্মকারের নিকট পৌঁছে হাতের হাতকড়া কেটে নিয়েছে কম কথা নয়। রাগে অধর দংশন করলেন তিনি।

বনহুরের সেই পালিয়ে আসা অনুচরটির মুখে বনহুরের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে রহমান বোমার মত ফেটে পড়ল; এত বড় কথা—তাদের সর্দারকে পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে গেছে? ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে লাগল রহমান।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত অনুচরকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল- যেমন করে হউক পুলিশদের হাত থেকে সর্দারকে মুক্ত করে আনতেই হবে, কিন্তু সেই আহত অনুচরটি রহমানের নিকটে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে অনেক বিলম্ব করে ফেলেছিল। একে তার পায়ে চোট লেগেছিল, তদুপরি কান্দাইয়ার বন থেকে বনহুরের আস্তানা অনেকটা পথ। কাজেই বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রহমান যখন তার সমস্ত অনুচরগণকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে অশ্বে আরোহণ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে গহন বনের নিস্তব্ধতা ভেদ করে জেগে উঠলো একটা ক্ষীণ অশ্ব-পদ শব্দ।

রহমান তাড়াতাড়ি মাটিতে কান লাগিয়ে শুনল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল- একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, কেউ যেন ঘোড়ায় চড়ে এদিকে ছুটে আসছে। হয়তো শত্রুপক্ষের লোকও হতে পারে। তোমরা সবাই রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাক। শত্রুর আগমনের সংগে সংগেই গুলী ছুঁড়বে।

রহমান এবং বনহুরের সমস্ত অনুচর গুলীভরা উদ্যত রাইফেল হাতে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ক্রমান্বয়ে অশ্ব-পদ শব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে।

কাছে- আরও কাছে এগিয়ে এলো শব্দটা। রহমান রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। অন্ধকারে তাকিয়ে আছে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হাতে তার উদ্যত রাইফেল।

শেষ রাত্রির জমাট অন্ধকার তখন গোটা বনভূমি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রহমান তার প্রধান অনুচরকে মশাল জ্বালাবার নির্দেশ দিল।

মশাল জ্বালাতেই গাঢ় অন্ধকার বনভূমি কিছুটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মশালের আলোতে চক্‌চক্ করে উঠল দস্যুদের হাতের রাইফেলগুলো।

যমদূতের মত এক একজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের শরীরে জমকালো পোশাক। চোখ দিয়ে যেন সবার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। তাদের সর্দার আজ বন্দী। হিংস্র বাঘের মত হয়ে উঠেছে এক একজন। রহমানের তো কথাই নেই।

সবাই যখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে, ঠিক সেই মুহূর্তে অশ্বারোহী এগিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচর এবং রহমান আনন্দ ধ্বনি করে উঠল—সর্দার!

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াল।

রহমান খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেল বনহুরের পাশে। বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা নিয়ে চুম্বন করে বললো- জানি সর্দার, আপনাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

বনহুর বললো- রহমান, আমার অনুচরগণের মধ্যে এমন কেউ আছে যার পেটে কথা হজম হয় না। কে সে লোক —আমি তাকে দেখতে চাই।

রহমান বনহুরের কণ্ঠস্বরে শিউরে উঠল। প্রথমে তাকাল সে বনহুরের মুখের দিকে, তারপর দণ্ডায়মান সকল অনুচরের মুখের দিকে।

বনহুর গর্জে উঠল—কে সে, যে সামান্য একটা কথা চেপে রাখতে পারে না। এবার বনহুর তার অনুচরদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকে মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল।

রহমান নিজে মশাল ধরল প্রত্যেকের মুখের কাছে। হঠাৎ বনহুর বলে ওঠে—শয়তান। সঙ্গে

Generated by CamScanner from intsig.com

জাফরের চুল ধরে টেনে বের করে আনে।

সবাই অবাক হয়।

বনহুর কিন্তু জাফরের মুখোভাব লক্ষ্য করেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে জাফরের মুখমণ্ডল।

হাতজোড় করে বলে —সর্দার, আমিই বলেছিলাম নূরীর কাছে এবারের মত মাফ করে দেন। মাফ করে দেন সর্দার। মাফ করে........

জাফরের কথা শেষ হয় না। বনহুরের রিভলভারের গুলী তার বক্ষ ভেদ করে চলে যায়। একটা তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে জাফর। কিছুক্ষণ ছটফট করে নীরব হয়ে যায় দেহটা।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে— নিয়ে যাও। শিয়াল-কুকুরের মুখে ফেলে দাও।

বনহুর এবার আস্তানার ভিতরে প্রবেশ করে।

পাহারারত দস্যুগণ দু'ধারে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। বনবহুর এগিয়ে যায় নিজের কক্ষের দিকে।

বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ে। হাতের রিভলভারখানা ছুঁড়ে ফেলে দূরে টেবিলের ওপর। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। আর মনের অস্থিরতা ফুটে ওঠে মুখমণ্ডলে।

বিশ্রামাগারের উজ্জ্বল আলোতে বনহুরকে আজ অদ্ভুত লাগছিল। কখনও পায়চারি করে, কখনও বিছানায় গিয়ে বসে, কখনও মুক্ত জানালার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্রমে পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে আসে।

বনহুরের মনের অস্থিরতা এতটুকু কমে না।

নূরী কিন্তু আড়ালে থেকে সব দেখছিলো। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ভুল সে করেছিল, তার জন্য কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল করে ফেলেছিল। বনহুরকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে নূরী এক বিন্দু পানি পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মনের মধ্যে তার একটা অনুশোচনার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছিল। বনহুর তাকে অবহেলা করতে পারে। পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে পারে, অন্য মেয়েকে ভালবাসতে পারে, তবু নূরী কিছুতেই বনহুরকে ত্যাগ করতে পারে না। বনহুরের স্মৃতি সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

কান্দাইয়ার বন থেকে ফিরে আসার পর সেই যে নূরী শয্যা নিয়েছিল, একটিবারও ওঠেনি বা কিছু খায় নি। দাসী এসে কয়েকবার খাবার জন্য অনুরোধ করছে, কিন্তু নূরী মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল বিছানায়। কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত চোখের পানিও শুকিয়ে গিয়েছিল।

গোটা রাত কখনও নূরী কেঁদেছে, কখনও স্তব্ধ হয়ে মৃতের ন্যায় বিছানায় পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ দাসী এসে যখন জানাল বনহুর ফিরে এসেছে তখন কি যে আনন্দ হয়েছিল নূরীর মনে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছুটে এসেছিল সে বনহুরের পাশে, কিন্তু সম্মুখে আসতে পারেনি। সে—সাহস পায় নি।

আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দেখছিল সে বনহুরকে। খোদার নিকট হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করছিল।

কিন্তু গোটা রাত শেষ হয়ে এলো, বনহুর অস্থিরভাবে কক্ষে পায়চারি করছে, মুখমণ্ডলে তাঁর গভীর উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠেছে। নূরী তখন আর স্থির থাকতে পারল না, এক সময় ছুটে গিয়ে বনহুরের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

বনহুর কঠিন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর এক ঝটকায় পা সরিয়ে নিল।

Generated by CamScanner from intsig.com

নূরী পুনরায় দু'হাতে বনহুরের পা জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল— হুর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

বনহুর এবারও কোন কথা বলল না।

নূরীর অশ্রু বনহুরের পা দু'খানার উপর মুক্তাবিন্দুর মত ঝরে পড়তে লাগল।

বনহুর আর দাঁড়াল না, নূরীর হাতের মধ্যে থেকে পা দু'খানাকে টেনে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

নূরী লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে।

পূর্বদিনের সেই স্থানে একটা বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে আছে শিকারী ভদ্রলোক। আজ এখানে দস্যু বনহুর তাকে অশ্ব ফেরত দেবার কথা আছে।

মিঃ হারুন দলবল নিয়ে একটি গোপন স্থানে প্রতীক্ষা করছেন। বনহুরকে আজ তারা গ্রেফতার করবেই।

মিঃ হারুনের সঙ্গে রয়েছেন মিঃ হোসেন এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। সকলেই উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তাকিয়ে আছে এ বৃক্ষের নিচে শিকারী ভদ্রলোকের দিকে।

ক্রমে রাত বেড়ে আসে।

শীতের কনকনে হাওয়া অফিসারদের শরীরে কম্পন ধরায়। প্রত্যেকের শরীরেই ওভারকোট। পায়ে গরম মোজা। হাতে পশমী গ্লাবস। তবুও ঠক ঠক করে কাঁপছেন তাঁরা। আজ সন্ধ্যা থেকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। কিছুক্ষণ আগে সামান্য একটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। হিমেল হাওয়া বইছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিজলী চমকাচ্ছে।

এখানে পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন যখন দলবল নিয়ে দস্যু বনহুরের জন্য প্রতীক্ষা করছেন, ঠিক সেই সময়ে মিঃ শঙ্কর রাও-এর দরজায় এক ভদ্রলোক কড়া নাড়লেন।

এত রাতে হঠাৎ কে তাঁকে বিরক্ত করতে এলো! একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজা খুলে বললেন— কাকে চান?

ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—আপনিই কি মিঃ রাও? হ্যাঁ আমিই।

দেখুন, এক্ষুণি আপনাকে ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন যেতে বলেছেন। তিনি ফুলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথে যে বড় আমগাছটি রয়েছে, সেখানে অপেক্ষা করছেন। এই যে চিঠিখানা তিনি আপনাকে দিয়েছেন।

মিঃ শঙ্কর রাও কাগজখানা খুলে পড়লেন, তাতে লেখা রয়েছে— মিঃ রাও, শীঘ্র চলে আসুন, আমি ফুলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথের ধারে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনার জন্য একটি অশ্ব পাঠালাম, দেরী করবেন না যেন, চলে আসুন।

ইতি—
হারুন

শঙ্কর রাও লোকটার মুখে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম কি?

আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, আমার নাম মিঃ নৌশাদ আলী।

ও, আপনি মিঃ নৌশাদ আলী? এতক্ষণ আপনাকে চিনতে পারিনি, মাফ করবেন। আসুন, ভিতরে বসবেন, চলুন।

না, এখন নয়। আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

আচ্ছা, আসছি। শঙ্কর রাও অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করেন। একটু পরে গরম জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলেন— চলুন মিঃ নৌশাদ আলী।

চলুন।

Generated by CamScanner from intsig.com

শঙ্কর রাওকে একটি অশ্ব দেখিয়ে বললেন নৌশাদ আলী—এই অশ্বে আপনি চলে যান।

আর আপনি?

আমি একটু ফুলবাড়ি থানা হয়ে আসছি। কথাটা শেষ করে অন্য একটি অশ্বে চেপে বসেন নৌশাদ আলী।

এসব রাস্তাঘাট শঙ্কর রাও এর অতি পরিচিত। তিনি ইতোপূর্বে আরও কয়েকবার ফুলবাড়ি গ্রামে গিয়েছিলেন। আজ রাত দুপুরেও পথ চিনতে ভুল হয় না তার।

ঘণ্টা দেড়েক চলার পর ফুলবাড়ি গ্রামের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। তিনি ভালভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাতে লাগলেন।

যদিও আকাশ এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, তবু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বিদ্যুতের আলোতে তিনি দেখতে পেলেন ফুলবাড়ি গ্রামের পথে একটি আমগাছের তলায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ রাও অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিলেন।

ওদিকে মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়ালেন। অশ্ব-পদশব্দ ক্রমান্বয়ে আমগাছতলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলেন মিঃ হারুন—হ্যাঁ, সত্যিই একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে চেপে গাছটার নিচে পৌঁছে গেছে।

কালবিলম্ব না করে মিঃ হারুন হুইসেলে ফুঁ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পুলিশ-ফোর্স আম গাছতলায় হাজির হলো। উদ্যত রাইফেল হাতে ঘেরাও করে ফেলল অশ্বারোহীকে।

মিঃ হারুন রিভলভার উদ্যত করে ধরে বললেন– খবরদার, নড়লেই গুলী ছুঁড়বো।

একি কাণ্ড! শঙ্কর রাও হকচকিয়ে গেলেন। তবু হাত তুলতে বাধ্য হলেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— গ্রেফতার কর।

মিঃ শঙ্কর রাও তখন অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বলে ওঠেন— আমি— আমি শঙ্কর রাও।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। মিঃ হারুন এবং তাঁর দলবল বিস্ময়ে 'থ' মেরে যায়— এ যে মিঃ শঙ্কর রাও। প্রথমে কারও মুখে কথা সরে না, একটু পরে মিঃ হারুন বলে ওঠেন— আপনি কেন?

শঙ্কর রাও কেমন যেন হাবা বনে গিয়েছিলেন, ঢোক গিলে বললেন– আপনি আমাকে ডেকে পাঠাননি?

আমি! না তো। কে বলল এ কথা আপনাকে?

কেন, মিঃ নৌশাদ আলী গিয়েছিলেন। আপনার চিঠিও নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

মিঃ হারুন গম্ভীর হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন দস্যু বনহুরেরই এই কাণ্ড।

শিকারী ভদ্রলোক এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এসব দেখছিল। যা হোক, তার অশ্বটা যে ফেরত পেয়েছে এই যথেষ্ট।

মিঃ হারুন যেন বেকুব বনে যান। এমন অপদস্থ তিনি আর কোনদিন হন নি। দস্যু বনহুরের ওপর তাঁর রাগ চরমে ওঠে।

অধর দংশন করেন তিনি।

এমন সময় একটা হাসির শব্দ ভেসে আসে—হাঃ হাঃ হাঃ। অদ্ভুত সে হাসির শব্দ। পুলিশবাহিনী এবং অফিসারগণ অবাক হয়ে যায়। মিঃ হারুন পুলিশ ফোর্সকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। নিজেও ছুটে যান যেদিক থেকে হাসির শব্দটা এসেছিল, সেই দিকে।

Generated by CamScanner from intsig.com

বারবার মিঃ হারুনের রিভলভার গর্জে উঠতে লাগল– গুড়ুম গুড়ুম---

কিন্তু অনেক সন্ধান করেও দস্যু বনহুরের পাত্তা মিলল না। এক সময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে চললেন মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে।

শিকারী তার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নিজ বাড়ির দিকে রওনা দিল। তার অতি আদরের অশ্বটিকে ফেরত পেয়ে খুশিতে ভুলে গেলো সব। ভুলে গেছে দস্যু বনহুরের গতকালের কথাগুলো।

অশ্ব নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সে।

ফুলবাড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে একটি প্রান্তর, তারপরই শহরের বড় রাস্তা পড়বে। শিকারী প্রান্তরের মাঝখানে এসে পৌঁছল। হঠাৎ তার সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়ালো এক অশ্বারোহী।

মুহূর্তে শিকারীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করল–কে?

সম্মুখস্থ অশ্বারোহী চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলো— দস্যু বনহুর।

শিউরে উঠল শিকারী। কানের কাছে প্রতিধ্বনি হলো গতকালের দস্যু বনহুরের কথাগুলো— কোন চালাকি করতে গেলে মরবে। আমি তোমায় ক্ষমা করব না। কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠলো ওর। ভীতকণ্ঠে বলে ওঠে– আপনি ...... আপনি.......

হ্যাঁ। এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। জান– দস্যু বনহুর কোনদিন অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করে না।

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে শিকারীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। দু'চোখে সর্ষে ফুল ভেসে ওঠে। কিছু বলতে যায় সে, কিন্তু তার পূর্বেই বনহুরের রিভলভার গর্জে ওঠে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যায় শিকারী।

বনহুর একবার মাত্র ফিরে তাকায়, তারপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

❑

আসুন, আসুন, ডাক্তার বাবু। জমিদার ব্রজবিহারী রায় ডাক্তারকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

ডাক্তার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ আপনার কন্যা কেমন আছে রায় বাবু?

আগের চেয়ে সুভা এখন কিছুটা ভাল। চলুন, ওকে দেখবেন চলুন।

চলুন। ডাক্তার ব্রজবিহারী রায়কে অনুসরণ করলেন।

ব্রজবিহারী রায়ের মনে এখন অনেকটা শান্তি ফিরে এসেছে। এই ডাক্তারের প্রচেষ্টাতেই সুভাষিণী আজ আরোগ্যের পথে। কাজেই ডাক্তারকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করেন। তাছাড়া এ ডাক্তার সম্বন্ধে রায়বাবু গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন,—অন্যান্য ডাক্তারের চেয়ে ইনি কেমন যেন স্বতন্ত্র। টাকার লোভী যে ইনি নন, তাও বুঝতে পেরেছিলেন। এতদিন যত ডাক্তারই এসেছেন সুভাষিণীর চিকিৎসার জন্য প্রথমেই তাঁরা টাকার প্রশ্ন তুলেছেন। সবাই যেন টাকার জন্য তাঁর কন্যার চিকিৎসা করতে এসেছেন। শুধু একটি মাত্র ডাক্তার, যিনি এখনও টাকার কোন প্রশ্ন তোলেননি।

ডাক্তার প্রথম দিন দেখে যাবার পর কয়েক দিন আর আসেন নি। ব্রজবিহারী রায় ভেবেছেন, এ ডাক্তারও চলে গেলেন—আর আসবেন না। কিন্তু হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন। সুভাকে দেখলেন, ঔষধপত্র দিলেন। তারপর মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন। সুভাষিণীকে দেখেন, ঔষধপত্র দিয়ে যান।

সুভাষিণীর দিকে তাকিয়ে ব্রজবিহারী রায় অনেকটা সান্ত্বনা খুঁজে পান। সুভাষিণীর মা

Generated by CamScanner from intsig.com

জ্যোতির্ময়ী দেবীর মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ ফিরে এসেছে। যদিও সুভাষিণী এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেনি, তবু আগের চেয়ে এখন কিছু ভাল। খাবার দিলে খায়। স্নানের সময় আপন মনে মাথায় জল ঢালে। কাপড় পরে, চুল আঁচড়ে দিলে চুপ করে থাকে। কিন্তু এখনও সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। এমন কি বৌদি চন্দ্রাদেবীর সঙ্গেও না।

ডাক্তার এলে সুভাষিণীর মধ্যে যেন একটু পরিবর্তন দেখা যায়। চোখ দুটো ওর উজ্জ্বল দীপ্তময় হয়ে ওঠে। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে সে ডাক্তারের গভীর দু'টি নীল চোখের দিকে।

ডাক্তারকে নিয়ে ব্রজবিহারী রায় কন্যার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

চন্দ্রাদেবী তখন সুভাষিণীর চুল বেঁধে দিচ্ছিল। শ্বশুরের সঙ্গে ডাক্তারকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে মাথার কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল চন্দ্রাদেবী। সুভাষিণীর চুল বাঁধা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সুভাষিণী নতমুখে যেমন বসেছিল—তেমনি রইলো। চোখ তুলে চাইলো না সে।

ব্রজবিহারী রায় কন্যাকে সম্বোধন করে বলেন—মা সুভা, দেখ ডাক্তার বাবু এসেছেন।

সুভাষিণী ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল।

ডাক্তার তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তিনি এবার সুভার পাশের আসনে বসে বললেন—দেখি আপনার হাতখানা।

সুভাষিণী হাতখানা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

ডাক্তার হেসে বললেন—আগের চেয়ে অনেক ভাল মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, এর জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

একটু থেমে পুনরায় বললেন ব্রজবিহারী রায়—কিন্তু আমি বড়ই দুঃখিত যে, আজও আপনি একটি পয়সাও গ্রহণ করলেন না।

সেজন্য দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই রায় বাবু। আপনার কন্যা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেনি এখনও।

ব্রজবিহারী রায় পুত্রবধূকে লক্ষ্য করে বললেন— বৌমা, ডাক্তার বাবুর জন্য একটু জলখাবার তৈরি করে নিয়ে এসো।

চন্দ্রাদেবী হেসে বলল—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

চন্দ্রাদেবী বেরিয়ে গেল। ব্রজবিহারী রায় পুত্রবধূর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যি ডাক্তারবাবু, কি বলব, বৌমা না থাকলে সুভা-মাকে আমরা কেউ খাওয়াতে পারতাম না। এমন কি ওর মায়ের হাতেও সে খায় না। এখন সুভা আমার স্নান করে। খাবার নিজ হাতে তুলে খায়। আপন মনে বলে চলেছেন রায়বাবু।

সুভাষিণী কিন্তু তখনও তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের চোখের দিকে, ডাক্তারও স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সুভাষিণীর দিকে। ডাক্তারের দৃষ্টির মধ্যে সে যেন খুঁজে পেয়েছে তার না পাওয়ার বস্তুটির সন্ধান।

উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়েছিল। চন্দ্রাদেবী কখন যে সকলের অলক্ষ্যে কক্ষে প্রবেশ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তা কেউ খেয়াল করেনি। একটু কেশে বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী— এই যে জলখাবার এনেছি।

চন্দ্রাদেবীর কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে আসে ডাক্তারের। তিনি তাকান চন্দ্রাদেবীর দিকে।

ব্রজবিহারী রায় তখনও বলে চলেছেন—বৌমার গুণ আর কত বলব ডাক্তার বাবু। এমন মেয়ে আর হয় না। এই দেখুন, এতগুলো জলখাবার কত অল্প সময়ে তৈরি করে আনল।

চন্দ্রাদেবীর মনে কিন্তু তখন একটা চিন্তাস্রোত বয়ে চলেছে। শুধু আজ নয়, আরও কয়েক

Generated by CamScanner from intsig.com

দিন সে লক্ষ্য করেছে—সুভা আর ডাক্তার নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে উভয়ে উভয়ের দিকে।

আজ চন্দ্রাদেবীর মনে প্রশ্নটা ধাক্কা মারে। সে শুধু বুদ্ধিমতী নারী নয়– শিক্ষিতাও। তার, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন একটা কিছু রয়েছে। তাছাড়া সবাই ডাক্তারকে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করলেও চন্দ্রাদেবী কোনদিন এই ডাক্তারটিকে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করতে পারেনি। কেন যেন ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও সঙ্কোচিত হয়ে পড়ত সে। ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারত না চন্দ্রাদেবী। দৃষ্টি নত করে নিতে বাধ্য হত কিন্তু কেন যে কথা বলতে পারত না সে নিজেও জানে না।

সেদিন ডাক্তার সুভাষিণীর জন্য নতুন ঔষধপত্র দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ব্রজবিহারী রায় অন্যান্য দিনের মতো আজও ডাক্তারকে বিদায় দেবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

চন্দ্রাদেবী বলে ওঠেন— বাবা, আপনি সুভার পাশে বসুন, আমার একটু কাজ আছে।

অগত্যা ডাক্তার বাবুকে সেখান থেকেই বিদায় দিয়ে কন্যার পাশে গিয়ে বসলেন ব্রজবিহারী রায়।

জমিদার বাড়ি— অনেকগুলো গেট পেরিয়ে তবেই হলঘরের দরজায় পৌঁছান যায়। তারপর বাইরে বের হবার পথ। ডাক্তার পরপর কয়েকটা গেট পেরিয়ে হলঘরের বারান্দায় পৌঁছলেন। তারপর যেমনি তিনি বড় গেটের দিকে পা বাড়াবেন অমনি একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চন্দ্রাদেবী, পেছন থেকে ডাকল—ডাক্তার বাবু।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার। বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন। ততক্ষণ চন্দ্রাদেবী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পূর্বে এত কাছে কোনদিন সে আসেনি।

ডাক্তার কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী—ডাক্তার বাবু, আপনি কে?

ডাক্তারের মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে ওঠে, বলে—সন্দেহ হচ্ছে?

হ্যাঁ। আপনি ডাক্তার নন।

কেন, আপনার ননদিনী কি আরোগ্য লাভ করছে না?

তা জানি না, কিন্তু আপনি যে ডাক্তার নন, এ আমি জানি। বলুন আপনি কে?

ডাক্তার কিছু ভেবে বললেন—চন্দ্রাদেবী, সত্যিই আমি ডাক্তার নই। কিন্তু.....

কিন্তু নয়, আপনি আমার নিকট লুকাতে চেষ্টা করবেন না, আপনার আসল পরিচয় আমি জানতে পেরেছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আপনি–আপনি----

বলুন, বলুন?

আপনি দস্যু বনহুর।

ধন্যবাদ। আপনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন সেজন্য আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হই নি।

জানেন, আমি এখনি আপনাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারি।

সে জন্য আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। বরং আপনার ননদের চিকিৎসার হাত থেকে উদ্ধার পেতাম। চন্দ্রাদেবী, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি গোপনীয় কথা আছে! যদি মনে কিছু না করেন···

চন্দ্রাদেবী গম্ভীর কণ্ঠে বলে—দস্যু বলে আমি আপনাকে ভয় করি না। যদি বলার মত কথা হয় বলতে পারেন।

Generated by CamScanner from intsig.com

সামনে দাঁড়িয়ে একটি নারী এতবড় কথা বলতে পারে না। চন্দ্রাদেবীর সাহসের পরিচয় পেয়ে খুশি হলো সে, চারদিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল—দেখুন.. সুভাষিণীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে হলে আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।

বলুন আমি কি করতে পারি?

মাধবগঞ্জের জমিদারপুত্র মধুসেনের সঙ্গে সুভাষিণীর বিয়ে হবে, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সহায়তা করবেন।

রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী–সুভা যে আপনাকে ভালবাসে।

সে কথায় কান না দিয়ে বলে ওঠে ডাক্তারবেশী দস্যু বনহুর—চন্দ্রাদেবী, সুভা যে ডাক্তারকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছে এটা হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন।

হ্যাঁ করেছি। কিন্তু সে ডাক্তারকে ভালবাসেনি, ভালবেসেছে তার দু'টি চোখকে।

চন্দ্রাদেবী!

হ্যাঁ, দস্যু হলেও আপনি মানুষ। সবাই আপনাকে না বুঝলেও আমি জানি আপনার হৃদয় অতি মহৎ। আপনি আমার ছোট বোনের মত আদরের সুভাকে বাঁচান, বাঁচান–

উদ্বিগ্ন হবেন না চন্দ্রাদেবী। আমি যা বলব সেভাবে আপনাকে কাজ করতে হবে।

বলুন কি করতে হবে?

তেমন কোন কঠিন কাজ নয় চন্দ্রাদেবী। আমি এরপর মধুসেনকে সঙ্গে আনবো।

মধুসেন—সুভার-ভাবী স্বামী মধুসেন?

হ্যাঁ, তাকেই আমি ডাক্তার বেশে আনব। চন্দ্রাদেবী, আপনি ডাক্তার আর সুভাষিণীর দৈনন্দিন নিবিড় প্রেমে সাধ্যমত সাহায্য করবেন।

কিন্তু......

না, আর কিন্তু নয়। মনে রাখবেন চন্দ্রাদেবী, একথা আপনি ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে। যখন দেখবেন উভয়ের মধ্যে একটা গভীর বন্ধনের সৃষ্টি গড়ে উঠেছে তখন ডাক্তারের মুখোশ উন্মোচিত করে ফেলবেন—বাস, তারপর আপনাকে কিছু করতে হবে না।

এ কি করে সম্ভব হবে?

অসম্ভব কিছুই নয় চন্দ্রাদেবী। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি?

চন্দ্রাদেবী কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বে বনহুর বাইরে বেরিয়ে গেছে।

সুভাষিণীর কক্ষে ফিরে আসে চন্দ্রাদেবী। দেখতে পায় রায়বাবু বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। পুত্রবধূর আগমনে তিনি উঠে দাঁড়ান—আমার এখন তাহলে ছুটি?

হ্যাঁ বাবা, আপনি যান! আমি বসছি।

ব্রজবিহারী রায় বেরিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীর পাশে বসে। তখনও তার মনে চিন্তার বেড়াজাল জট পাকাচ্ছিল। দস্যু বনহুর স্বয়ং তাদের বাড়িতে আসে— যায় অথচ তারা কেউ জানে না সে কথা। নিভৃতে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠে চন্দ্রাদেবী। এ দাঁড়ি গোফের অন্তরালে না জানি কেমন একখানা মুখ লুকানো আছে—যে মুখখানার জন্য আজ সুভার এই অবস্থা। চন্দ্রাদেবীর মনে দস্যু বনহুরের আসল রূপ দেখার বাসনা জাগে।

❑

মিঃ হারুন অফিসে প্রবেশ করতেই সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ জাহেদ বলেন—স্যার, কালকের সেই শিকারী খুন হয়েছে।

বলেন কি! আঁতকে ওঠেন মিঃ হারুন।

Generated by CamScanner from intsig.com

হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে গিয়েছিলাম, পরীক্ষা করে দেখে এলাম। কালকেই সেই শিকারী ভদ্রলোককে কে বা কারা গুলী করে হত্যা করেছে।

হুঁ, নিশ্চয় এ দস্যু বনহুরের কাজ।

হ্যাঁ স্যার, আমারও তাই মনে হয়।

লাশ কি মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন?

না স্যার, আপনাকে জিজ্ঞেস না করে আমি কিছুই করিনি। বেশ করেছেন। আমি লাশটা একবার পরীক্ষা করে দেখব। তাহলে আমি গাড়ি বের করতে বলি স্যার?

না, আমার গাড়িতেই যাব। আপনিও চলুন মিঃ জাহেদ।

মিঃ হারুনের গাড়ি বাইরেই অপেক্ষা করছিল। মিঃ হারুন— মিঃ জাহেদ এবং দু'জন পুলিশকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন।

গন্তব্যস্থানে পৌছে মিঃ হারুন দেখলেন, শিকারীর রক্তাক্ত দেহ একটা প্রান্তরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। খানিকটা জায়গা রক্তে জমাট বেঁধে আছে।

হঠাৎ মিঃ হারুনের নজরে পড়ল, লাশটার পাশে একটি কাগজের টুকরো পড়ে আছে। মিঃ হারুন কাগজের টুকরোখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে পড়লেন, "বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি এমনি করেই হয়।" –দস্যু বনহুর

মিঃ হারুন রাগে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন, বজ্রকঠিন স্বরে বললেন–দিন দিন দস্যু বনহুরের ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌছে যাচ্ছে। অচিরে তাঁকে পাকড়াও করতে না পারলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না।

লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে অফিসে ফিরে এলেন মিঃ হারুন এবং তার সঙ্গিগণ। এবার মিঃ হারুন পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য রওয়ানা দিলেন।

মিঃ আহমদের সঙ্গে মিঃ হারুনের অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল। শঙ্কর রায়কেও ডাকা হলো সেখানে। তিনিও এ ব্যাপারে কাজে নেমে পড়বেন কথা দিলেন।

আবার পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো।

এবার বিদেশ থেকে একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার এলেন দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে। ইতোপূর্বে তিনি কয়েকজন ভয়ংকর দস্যুকে গ্রেফতার করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। পুলিশ অফিসারটির নাম মিঃ জাফরী। যেমনি দুঃসাহসী তেমনি দুর্দান্ত। তাঁর মত জোয়ান এবং বলিষ্ঠ পুলিশ অফিসার কমই নজরে পড়ে।

দস্যু ভোলানাথকে গ্রেফতার করতে গিয়ে মিঃ জাফরীর চোয়ালে ভয়ংকর একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষত শুকিয়ে গেছে কিন্তু এখনও সেখানে একটা গভীর দাগ কাটা রয়েছে। সে দাগটা মিঃ জাফরীর চেহারাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

মিঃ জাফরী এসে পৌছতেই সমস্ত পুলিশ অফিসার তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। এমনি কি পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ পর্যন্ত মিঃ জাফরীকে স্বাগত জানাতে এলেন।

শহরের বিশিষ্ট ডাক বাংলোয় মিঃ জাফরীর থাকার ব্যবস্থা করা হল। মিঃ জাফরীর সঙ্গে একদল পুলিশ ফোর্সও এসেছিল। তারা বাংলোর পেছনে তাঁবু ফেলল।

ডাক বাংলোতেই মিঃ আহমদের সঙ্গে জাফরীর বৈঠক বসল। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত পুলিশ অফিসার এবং শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। মিঃ শঙ্কর রাও তার বাল্যবন্ধু ক্যাপ্টেন মিঃ আলমকে নিয়ে এসেছিলেন। সম্প্রতি মিঃ আলম লন্ডন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি এখন সুদক্ষ গোয়েন্দা।

এ বৈঠকে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হল।

Generated by CamScanner from intsig.com

শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের মধ্যে ধনী ব্যবসায়ী জনাব হারেস উদ্দিনও ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন প্রতিপত্তিশালী, ধনবান। কিন্তু তার মন ছিল নিতান্ত ছোট। টাকা পয়সাকে তিনি নিজ সন্তানের চেয়েও বেশি যত্ন করতেন। কাজেই দস্যু বনহুরকে তাঁর ভয় ছিল বেশি।

দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তিনি মিঃ জাফরীকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। বনহুরকে তাঁর নানা রকমের কুৎসা গেয়ে শোনালেন। এমন কি চৌধুরী সাহেবের কন্যা মনিরাকে দস্যু বনহুর চুরি করে নিয়ে গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল এ কথাও জানালেন।

মিঃ জাফরী অবশ্য জনাব হারেসের কথায় খুশি হতে পারছিলেন না। কারণ দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তার যা জানার প্রয়োজন তিনি পুলিশ ডায়েরী থেকেই জেনে নিয়েছেন এবং আরও নেবেন।

জনাব হারেস তবু থামলেন না। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে জানালেন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে আমিও আপনাদের সহায়তা করব। ছলে-বলে-কৌশলে—যে প্রকারেই হোক তাকে বন্দী করা প্রয়োজন।

জনাব হারেসউদ্দিনের পাশেই বসেছিলেন মিঃ আলম। এতক্ষণ তিনি নীরবে সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবার হেসে বললেন—দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য আপনার উৎসাহ সত্যি প্রশংসনীয়। আপনার সহায়তা পেলে মিঃ জাফরী নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

মিঃ আলমের কথায় মিঃ জাফরী তাকালেন তাঁর দিকে। মিঃ আলমের শরীরে সাহেবী পোশাক পরিচ্ছদ। মাথায় আমেরিকান ক্যাপ। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। চোখমুখ উজ্জ্বল দীপ্তময়! কণ্ঠস্বর গম্ভীর শান্ত সুমিষ্ট। মিঃ জাফরী আলমের কথায় খুশি হলেন।

সেদিন বৈঠকে আর বেশিদূর এগোয় না। সবাই বিদায় গ্রহণ করেন।

শুধু থেকে যান মিঃ আহমদ, মিঃ হারুন, শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম। তাঁরা এবার ডাকবাংলোর ভিতরে একটি সুসজ্জিত গোপন কক্ষে গিয়ে বসলেন। সকলের সম্মুখে তো গোপন আলোচনা চলে না, এবার শুরু হল তাদের মধ্যে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের গোপন পরামর্শ।

ইতোমধ্যে শঙ্কর রাও মিঃ আলমের সঙ্গে মিঃ আহমদ, মিঃ হারুন এবং মিঃ জাফরীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ আলমের ব্যবহারে এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় যথেষ্ট খুশি হলেন মিঃ জাফরী। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে মিঃ আলমের মত একজনকে পাশে পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন জানালেন।

মৃদু হেসে মিঃ আলম জানালেন—যতদূর সম্ভব তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

এক সময় সবাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

বনহুরের মোটর এসে থামলো নাইট ক্লাবের সম্মুখে। বনহুরের শরীরে দামী স্যুট। গাড়ি থেকে নেমে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো সে— তারপর এগুলো ক্লাবের দরজার দিকে।

ক্লাবে প্রবেশ করতেই একটা যুবতী তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল—হ্যালো মিঃ প্রিন্স!

বনহুর হাস্যোজ্জ্বলমুখে যুবতীকে অভ্যর্থনা জানাল—হ্যালো মিস ডালিয়া, ভালো তো?

ডালিয়া বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা দু'হাতে চেপে ধরল—খুব ভাল।

আর তুমি।

ভাল না।

কেন?

রাজ্য নিয়ে যে তোলপাড় শুরু হয়েছে!

তাই বুঝি আর তোমার সাক্ষাত পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ ডালিয়া।

Generated by CamScanner from intsig.com

বনহুর যুবতীর কথায় জবাব দিতে দিতে তাকায় ক্লাবের ভিতরের চারিদিকে। এগুতে থাকে সে। ডালিয়া চলে তাঁর সঙ্গে।

এক কোণে গিয়ে বসে বনহুর।

ডালিয়াও বসে তার পাশের চেয়ারে।

বয় এসে সম্মুখে দাঁড়াতেই বনহুর বলে—শুধু দু'কাপ কফি।

কেন, আর কিছু খাবে না?

না।

আজ তোমাকে বড্ড ভাবাপন্ন লাগছে প্রিন্স।

বনহুর পুনরায় আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একরাশ ধোঁয়া ছুঁড়ে দেয় সম্মুখে।

ধুম্রকুণ্ডলি হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে ডালিয়া—কই, কথা বলছ না যে?

বনহুরের দৃষ্টি তখন ক্লাব কক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় ওপাশের ভেলভেটের ভারী পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে একটি যুবক আর একটা যুবতী। কি যেন কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল দু'জনে।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে। হস্তস্থিত সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়াল।

ডালিয়া হেসে বলে—কি হল, উঠে পড়লে যে?

বনহুর ডালিয়ার কথায় কোন জবাব না দিয়ে এগুতে থাকে। সম্মুখস্থ যুবক-যুবতী তখন ক্লাবের দরজার দিকে এগিয়ে গেছে।

ক্লাবের গেটে এসে যুবতী দাঁড়িয়ে পড়ে। যুবক যুবতীর হাতে হাত রেখে বিদায় গ্রহণ করে।

ক্লাবের সম্মুখে থেমে থাকা একটি গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দেয় যুবক। যুবতী হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। তারপর ফিরে যায় ক্লাব কক্ষের ভেতরে।

বনহুর কালবিলম্ব না করে নিজের গাড়িতে চেপে বসে। সম্মুখের গাড়িখানা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

বনহুর নিজের গাড়ি নিয়ে সম্মুখের গাড়িখানাকে ধাওয়া করে। এ পথ সে পথ দিয়ে আগের গাড়িখানা এগিয়ে চলেছে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে গাড়ি চালাচ্ছে বনহুর।

একটা সরু গলির মধ্যে সম্মুখস্থ গাড়িখানা প্রবেশ করতেই বনহুর নিজের গাড়িখানাও সেই গলি পথে নিয়ে গেল এবং স্পীড বাড়িয়ে দিল।

একে সরু গলি তদুপরি পথের দু'ধারে ড্রেন, কাজেই সম্মুখস্থ গাড়িখানার গতি অনেক কমে এসেছিল।

বনহুর অতি অল্প সময়ে সম্মুখস্থ গাড়ির নিকটে পৌঁছে যায়। একেবারে নির্জন রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে শব্দহীন রিভলবারখানা বের করে সম্মুখের গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাড়িখানা থেমে যায়।

বনহুর রিভলভার হাতে নেমে পড়ে। এক লাফে সম্মুখের গাড়িখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথার ক্যাপটা সামনে আরও কিছুটা টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে—শিগগির নেমে এসো।

যুবক ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় বনহুরের দিকে। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—তুমি কে?

আমি যেই হই—যদি বাঁচতে চাও— নেমে এসো।

অগত্যা যুবক গাড়ির দরজা খুলে নেমে আসে।

Generated by CamScanner from intsig.com

বনহুর যুবকের বুকে রিভলভার চেপে ধরে বলে—পেছনের গাড়িতে উঠে বস।

জনহীন গলিপথে রিভলভারের মুখে দাঁড়িয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। নিঃশব্দে পিছনের গাড়িতে উঠে বসল।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়। পেছনে চালিয়ে গাড়িখানা বড় রাস্তায় বের করে আনে। বড় রাস্তাও তখন জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

বনহুর যুবককে নিয়ে অতি দ্রুত গাড়িখানাকে অন্য একটা নির্জন পথে চালনা করে। কিছুক্ষণ চলার পর একটা বাড়ির সামনে এসে বনহুর গাড়ি রাখে। নিজে নেমে দরজা খুলে ধরল।

যন্ত্রচালিতের ন্যায় নেমে পড়ে যুবক। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। নীরবে বনহুরকে অনুসরণ করে সে।

প্রকাণ্ড বাড়ি, কিন্তু কোথাও আলো নেই।

বনহুর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বনহুর দরজায় পা রাখতেই একটা নীলাভ আলো পথটাকে উজ্জ্বল করে তুলল।

বনহুর যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। লোকটি দরজা বন্ধ করে কোথায় অদৃশ্য হলো যুবক বুঝতেই পারল না, বরং মনে মনে আরও ভীত হল সে।

যুবক যে একেবারে দুর্বল তা নয়। সে এত সহজেই গোবেচারার মত এখানে চলে আসত না, কিন্তু ঐ রিভলভারখানাকে তার যত ভয়। আজকাল প্রায়ই হত্যা চলছে। পথে-ঘাটে-মাঠে শুধু হত্যাকাণ্ড। সেদিনের শিকারী হত্যা কাহিনীও সে কাগজে পড়েছে। ভয়ে শিউরে উঠেছিল– সেও তো রাত বিরাত বাইরে থেকে ফেরে। হঠাৎ যদি তার অবস্থাও কোনোদিন তেমন হয়। তার চিন্তা আজ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তাই সে কোন কথা বলতে সাহসী হয়নি– ভেবেছে, দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে।

বনহুর এগিয়ে চলেছে।

বনহুর একটা বড় ধরনের কক্ষে প্রবেশ করল।

যুবকটা বনহুরের পেছনে পেছনে ঐ কক্ষে ঢুকল।

কক্ষটি আবছা অন্ধকার। জিরো পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। বাল্বের ওপর পুরু ধরনের একটি আবরণ রয়েছে। যাতে আলো বাইরে না যায়, সে জন্যে এই আবরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বুঝতে পারে যুবক।

যুবক এতক্ষণে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। এবার কিছুটা সাহস হল তার, জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে? আমার কাছে কি চাও?

বনহুর পায়চারী করছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বলে—আমি দস্যু বনহুর।

যুবক চমকে ওঠে।

বনহুর হেসে বলে—আমি তোমাকে হত্যা করতে আনি নি।

তবে কি টাকা চাও?

না।

তবে কি চাও আমার কাছে?

আমি চাই তোমার জীবন।

জীবন!

হ্যাঁ।

এই তো বললে তুমি আমাকে হত্যা করবে না।

দস্যু বনহুর কোন দিন বিনা কারণে কাউকে হত্যা করে না মধুসেন।

Generated by CamScanner from intsig.com

দস্যুর মুখে তার নিজের নাম শুনে আশ্চর্য হয় মধুসেন।

বনহুর বুঝতে পারে, হেসে বলে—শুধু তোমার কেন, তোমার ভাবী স্ত্রী সুভাষিণীর নামও আমার অজানা নেই। এসো, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

বনহুর এবার দেয়ালের গায়ে লাগান একটা সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে এলো সেখানে। বনহুর বলল –চল। নিজেও প্রবেশ করল ঐ দরজা দিয়ে ভেতরে।

এবার মধুসেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হল– কক্ষটি উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত। সেই কক্ষের উজ্জ্বল আলোতে মধুসেন স্পষ্ট দেখতে পেল বনহুরকে। চমকে উঠল, এ সেই লোক, যে তাকে একদিন ক্লাবকক্ষে গুণ্ডাদের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। দস্যু বনহুর তাহলে শুধু দুর্দান্তই নয়- মহৎও বটে। মধুসেনের ভয় আরও কমে আসে। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এখানে আনেনি। মধুসেন অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে বনহুরকে। যাকে সে কোনদিন দেখবে বলে আশা করেনি, সেই দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

দস্যু বনহুর মাথার ক্যাপটা খুলে টেবিলে রাখল।

মধুসেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এত সুন্দর দস্যু বনহুর, কল্পনাও করতে পারেনি মধুসেন।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল– সুভাষিণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে কোন অমত আছে?

মধুসেন বিস্ময়ভরা নয়ন তুলে তাকাল। স্থিরকণ্ঠে বললো– না। তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে আমার কোন অমত নেই।

বেশ।

কিন্তু সুভাষিণী আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে যদি রাজী না হয়? তাছাড়া সে তো এ বিয়েতে----

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না মধুসেন। তোমাকে যা বলব– সেভাবেই কাজ করবে।

আগ্রহভরা গলায় বলে ওঠে মধুসেন—সুভাষিণীকে আমি স্ত্রীরূপে পাব।

চেষ্টা করলেই পাবে, আমি যা বলি শোনো। বনহুর এবার মধুসেনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজেও বসে পড়ে তার পাশের চেয়ারে।

কি করতে হবে তা বেশ করে বুঝিয়ে দেয় সে মধুসেনকে। বনহুর মধুসেনকে নিয়ে যখন গাড়িতে চেপে বসে, তখন দিনের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোটা রাত সে মধুসেনকে খুব করে শিখিয়ে তৈরি করে নিয়েছে। মধুসেনের শরীরে ডাক্তারের ড্রেস। বনহুর নিপুণ হাতে তাকে ডাক্তারের পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছে।

এখন কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না সে পূর্বের ঐ ডাক্তার নয়। পার্থক্যের মধ্যে শুধু ডাক্তারের চোখে আজ গগল্‌স্ রয়েছে।

প্রতিদিনের মত ব্রজবিহারী রায় আজও ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ডাক্তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকভাবে ব্রজবিহারীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করে বললেন— সুভাষিণী কেমন আছে রায়বাবু?

আগের চেয়ে এখন অনেকটা ভালই বলে মনে হচ্ছে ডাক্তার বাবু। কিন্তু আপনার গলার স্বর যেন একটু কেমন শোনাচ্ছে।

একটু কেশে বললেন ডাক্তার—গতরাতে ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গলাটা বসে গেছে। চোখ দুটোও কেমন টন টন করছে --------

ও, তাই বুঝি গগল্‌স্ পরেছেন?

Generated by CamScanner from intsig.com

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আপনি এবার সুভার কক্ষে যান। বৌমা সেখানে আছে।

এবার ডাক্তার বিপদে পড়লেন। এই যা সেরেছে। সুভাষিণীর কক্ষ তো তার জানা নেই।

একটু ভেবে বললেন- রায়বাবু, আপনিও চলুন।

আচ্ছা চলুন। সত্যি ডাক্তার বাবু, এখনও আপনার সঙ্কোচ কাটল না'? ধরতে গেলে এটা তো আপনার নিজের বাড়ির মত হয়ে গেছে।

ডাক্তার এ কথায় শুধু হাসলেন।

সুভাষিণীয় কক্ষে প্রবেশ করে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। রায় বাবু বলে ওঠেন—থামলেন কেন? আসুন।

সুভাষিণীর পাশে বসে ছিল চন্দ্রাদেবী। শ্বশুরের কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকায়। প্রথমে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে ওঠে। হঠাৎ আজ তার চোখে গগল্‌স্ কেন'? পরক্ষণেই মনে পড়ে দস্যু বনহুরের কথাগুলো---চন্দ্রাদেবী এরপর আমি আর আসব না। আসবে আপনাদের ভাবী জামাতা মধুসেন। আপনি ওদের দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় প্রেমের আবেষ্টনী গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন------

চন্দ্রাদেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ডাক্তারের মুখের দিকে। চিনবার কোন উপায় নেই। কিন্তু চন্দ্রাদেবীর মনের মধ্যে একটা কাঁটার আঘাত যেন খচ্ খচ্ করে উঠল। এতদিন যার সান্নিধ্যে সুভাষিণী আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে এ সে নয়। তার স্থানে আজ অন্য একজন।

চন্দ্রাদেবীকে ভাবাপন্ন দেখে বলে ওঠেন ব্রজবিহারী রায়—বৌমা ডাক্তার বাবুকে বসতে দাও।

আসুন ডাক্তার বাবু। তারপর ব্রজবিহারী রায়কে লক্ষ্য করে বলে চন্দ্রাদেবী—বাবা, আপনি যান, আমি ডাক্তার বাবুকে সব বলছি।

বেশ মা, বেশ। যাই দেখি সরকার আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে একবার শহরে পাঠাব। ব্রজবিহারী রায় বেরিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী জানে, এ নতুন লোক। কাজেই সে তাকে সাহায্য করে।

একটু হেসে বলে— আসুন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার এগিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী তাকে সুভাষিণীর পাশের চেয়ারে বসতে ইংগিত করে বলে— সুভাকে দেখুন ডাক্তার বাবু। গত ক'দিনের চেয়ে এখন সে অনেক ভাল। তারপর সুভাষিণীকে লক্ষ্য করে বলে.. সুভা, দেখো ডাক্তার বাবু এসেছেন।

ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল সুভাষিণী।

ডাক্তার তাকাল সুভাষিণীর দিকে। আজ চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখের অন্তরালে ডাক্তারের চোখ দুটোই ছিলো তার সম্বল। আজ সেই চোখ দুটো ঢাকা পড়েছে কালো চশমার আড়ালে। সুভাষিণীর মুখমণ্ডল বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

চন্দ্রাদেবী বলে- ডাক্তারবাবু, আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য একটু জলখাবার তৈরি করে নিয়ে আসি। কথা শেষ করেই বেরিয়ে যায় সে।

বেশ কিছুক্ষণ ডাক্তার থ'মেরে বসে থাকেন।

সুভাষিণী তাকিয়ে আছে তখনও ডাক্তারের কালো চশমায় ঢাকা চোখ দুটোর দিকে।

হঠাৎ ডাক্তার সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে বলে ওঠে— সুভা, অমন করে

Generated by CamScanner from intsig.com

কি দেখছো!

সুভাষিণীর ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে। কি বলতে গিয়ে থেমে যায় সে।

ডাক্তার পুনরায় বলে— বল, বল সুভা!

তোমার কালো চশমা খুলে ফেল ডাক্তার। স্তব্ধ কণ্ঠে কথাটা বলে ওঠে সুভাষিণী।

চোখ দুটো বড্ড জ্বালা করছে। তুমি কি চাও আমার দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাক।

না।

সুভা! আবেদন মাখা কণ্ঠস্বর ডাক্তারের।

এরপর হতে ডাক্তার রোজ আসে।

চন্দ্রাদেবীও ডাক্তারকে সুভাষিণীর পাশে বসিয়ে কোন না কোন কাজের ছুতো ধরে বেরিয়ে যায়।

সুভাষিণী এখন বেশ কথা বলে, আগের চেয়ে এখন সে অনেক ভাল। নিজেই স্নান করে, খায়, চুল বাঁধে।

ডাক্তার এলেই সুভাষিণী যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আজকাল নিজেই ডাক্তারের জলখাবার এনে দেয়। কোন কোন দিন ডাক্তারের সঙ্গে বাগানে বেড়ায়।

ব্রজবিহারী রায় এ ব্যাপারে কিছুই বলেন না। কারণ ডাক্তারের জন্য আজ তিনি প্রাণাধিক কন্যা সুভাকে ফিরে পেয়েছেন।

বেশ কিছুদিন চলে গেছে।

একদিন সুভাষিণী ডাক্তারের সঙ্গে বাগানে একটা হাস্নাহেনার ঝাড়ের পাশে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ সুভাষিণী বলে বসে— আজ কিন্তু তোমার চোখের চশমা খুলতে হবে।

আশ্চর্য কণ্ঠে বলে ওঠে ডাক্তার— কেন?

এখনও কি তোমার চোখ সারেনি ডাক্তার?

না।

আমি জানি— তুমি ডাক্তার নও।

তুমি তুমি— খুলে ফেল তোমার চোখের ঐ কালো চশমা। খুলে ফেলো তোমার দাড়ি গোঁফ। সুভাষিণী একটানে ডাক্তারের চোখের চশমা খুলে নেয়।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখ থেকে দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে। সুভাষিণী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—কে—কে আপনি? আমি— আমি দস্যু বনহুর।

নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকায় সুভাষিণী তার মুখের দিকে, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—না— না আপনি সে নন। বলুন বলুন আপনি কে?

বিশ্বাস হচ্ছে না? তা না হবারই কথা। কারণ তোমার সঙ্গে আমার দেখা এক অন্ধকারময় রাতে। ডাকাতের হাত থেকে তোমায় বাঁচিয়ে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিলাম— তারপর আর এক রাতে তোমায় এক গাছের নিচে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে তোমাকে নিয়ে গিয়ে এক হাসপিটালে ভর্তি করে দিলাম— মনে পড়ে এসব কথা তোমার?

সুভাষিণী স্তব্ধ হয়ে শুনে যায় ওর কথাগুলো। তাইতো, এসব কথা দস্যু বনহুর ছাড়া আর তো কেউ জানে না। তন্ময় হয়ে তাকায় সে ওর মুখের দিকে, ধীরে ধীরে সমস্ত পুরানো স্মৃতি তলিয়ে যায় কোন অতলে। নতুন করে এই মুখখানাই এঁকে যায় সুভাষিণীর মানসপটে।

সুভাষিণী ধীরে ধীরে মাথা রাখে মধুসেনের বুকে।

মধুসেন ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

এমন সময় চন্দ্রাদেবী একটু কেশে সেখানে উপস্থিত হয়।

Generated by CamScanner from intsig.com

চন্দ্রাদেবীর আগমনে চমকে সরে দাঁড়ায় সুভাষিণী। লজ্জিতও হয় সে।

এরপর একদিন চন্দ্রাদেবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। যাকে তারা এতদিন ডাক্তার জানত তিনি আসলে ডাক্তার নন। যাদবগঞ্জের জমিদার পুত্র-মধুসেন। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত কথা চন্দ্রাদেবী চেপে গেল এমন কি নিজ স্বামীর কাছেও সে বলল না এ কথা।

এরপর এক শুভলগ্নে মধুসেনের সঙ্গে সুভাষিণীর বিয়ে হল। বিয়ের পূর্বেই জেনেছিল সুভাষিণী যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে সে দস্যু বনহুর নয়— তার ভাবী স্বামী মধুসেন। তখন দস্যু বনহুরকে প্রায় ভুলে গেছে সে।

বিয়ের দিন।

অগ্নিকুণ্ড সাক্ষী রেখে মধুসেনের পাশে বসে সুভাষিণী যখন বিয়ের মন্ত্র পাঠ করছিল। তখন অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে আশীর্বাদের সুযোগ নিয়ে আর একজন এসে দাঁড়াল। সকলের অলক্ষ্যে সুভাষিণীর হাতে একটি ছোট বাক্স দিয়ে সরে পড়ল সে।

বিয়ের পর চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে নববধূর বেশে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল। গয়না পরাতে গিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল গয়নার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং মূল্যবান একটি নেকলেস রয়েছে। সবাই নেকলেসখানা দেখে বিস্মিত হল। এত মূল্যের নেকলেস কে দিয়েছে? কিন্তু কেউ বলতে পারে না।

বিদায়কালে চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে গিয়ে কোচওয়ানের মুখে নজর পড়তেই চমকে উঠল। কোচওয়ানের চোখ দুটো তার যেন পরিচিত বলে মনে হল। হঠাৎ একখানা মুখ ভেসে উঠল চন্দ্রাদেবীর মানসপটে। এ যে সেই ডাক্তারের চোখ। গভীর নীল দুটি চোখে অদ্ভুত চাহনি। চন্দ্রা আজও ভুলতে পারেনি সেই দৃষ্টিকে। এবার চন্দ্রাদেবী বুঝতে পারে সেই মূল্যবান নেকলেসখানা কে উপহার দিয়েছে। আবার সে ফিরে তাকাল পাগড়ি আর গালপাট্টায় ঢাকা কোচওয়ানের মুখে। কিন্তু ততক্ষণে কোচওয়ান গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সুভাষিণীর শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে বজরায় চড়ে।

ঘাটে এসে গাড়ি পৌঁছল। মধুসেন ও সুভাষিণী উঠলো গিয়ে বজরায়।

বজরা ছেড়ে দিল।

❑

বজরার ছাদে তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে শুয়ে আছে মধুসেন, পাশে বসে সুভাষিণী। সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মধুসেনের হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে।

আজ দোল পূর্ণিমা।

জ্যোস্নার আলোতে চারদিক ঝলমল করছে। মৃদুমন্দ বাতাসে বজরাখানা হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

মাঝিদের ঝুপ্ ঝুপ্ বৈঠার শব্দ আর নদীর জল উচ্ছ্বাসের কল কল ধ্বনি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

মধুসেন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে। দোল পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোতে সুভাষিণীকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল তার গলার মনিমুক্তা খচিত নেকলেসখানা। মধুসেন হেসে বলল সুভা যেমন সুন্দর তুমি, তেমনি সুন্দর তোমার ঐ মালাখানা। একেবারে অপূর্ব।

সুভাষিণী স্বামীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসে।

মধুসেন নেকলেসের লকেটখানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ লকেটের ঢাকনা খুলে

Generated by CamScanner from intsig.com

গেল। একি এর মধ্যে কাগজের টুকরা কেন। মধুসেন তাড়াতাড়ি জ্যোস্নার আলোতে কাগজের টুকরাটা মেলে ধরল। মাত্র দুটি শব্দ লেখা রয়েছে তাতে— দস্যু বনহুর। মধুসেনের কণ্ঠ দিয়ে নামটা উচ্চারিত হল।

সুভাষিণী চমকে উঠল, সেও অস্ফুটধ্বনি করে উঠল—দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি এ নেকলেসখানা তারই উপহার। মধুসেন কথাটা বলে তাকাল সুভাষিণীর মুখের দিকে।

সুভাষিণী তখন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মধুসেনের মুখমণ্ডল তখন উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন। এ বিয়ের পেছনে হিতৈষী বন্ধুর মত দস্যু বনহুর তাকে সাহায্য করেছে। বনহুরের এ উপকার সে জীবনে কখনও ভুলবে না।

মধুসেন সুভাষিণীকে ভাবাপন্ন হতে দেখে বলে ওঠে—কি ভাবছো সুভা?

সুভাষিণীর বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস—বলে, সে কিছু না।

মধুসেন ওকে টেনে নেয় কাছে।

বজরা এখন নারন্দী বনের পাশ কেটে সোনাইদী নদী বেয়ে এগুচ্ছে। রাত গভীর হয়ে এসেছে। ভোর রাতে বজরা গিয়ে পৌঁছবে যাদবগঞ্জে। মধুসেনের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সুভাষিণী।

মাঝিরা আপন মনে বৈঠা চালিয়ে চলেছে। হাতগুলো তাদের শিথিল হয়ে আসে। ঝিমুতে ঝিমুতে বৈঠা মারছিল ওরা।

দোল পূর্ণিমার চাঁদখানা কখন যে ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে মধুসেন বা সুভাষিণী কেউ জানে না।

হঠাৎ একটা হই হই চিৎকারে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বামীকে আঁকড়ে ধরল সুভাষিণী। বজরার মধ্যে যেন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মশালের আলোতে দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নদীবক্ষ। অস্ত্রের ঝনঝন আর রাইফেলের গর্জন সুভাষিণীর কানে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিল। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল সে চারদিকে।

মাঝিদের আর্ত চিৎকার ভেসে এলো তার কানে—বাবু ডাকাত পড়েছে ----বাবু ডাকাত পড়েছে---- মেরে ফেলল----মেরে ফেলল তার পরপরই নদীবক্ষে ঝুপ ঝুপ শব্দ। মাঝিরা লাফিয়ে পড়েছে নদীর পানিতে।

মধুসেন অসহায়ের মত তাকাল স্ত্রীর ভয়ার্ত মুখের দিকে। ততক্ষণে কয়েকজন মুখোশ পরা ডাকাত মধুসেনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মধুসেন কিছু বলার পূর্বেই একজন ডাকাত তার মাথায় লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে মধুসেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল বজরার ছাদে। সুভাষিণী আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢাকল। অমনি কে একজন ডাকাত তার গলা থেকে মূল্যবান নেকলেসখানা একটানে খুলে নিল।

সুভাষিণী দেখতে পেল তাদের বজরার পাশে কয়েকটা ছিপ নৌকা এবার ডাকাতের দল তার বিয়ের যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে বজরা থেকে লাফিয়ে পড়তে লাগল ঐ ছিপ নৌকাগুলোর ওপর।

মাত্র কিছু সময়, তারপর সব নিস্তব্ধ। শুধু এবার শোনা যেতে লাগল বজরার মধ্য হতে বরযাত্রীদের কাতর আর্তনাদ— বাবা গো মেরে ফেলল গো-ডাকাত! ডাকাত!

Generated by CamScanner from intsig.com

দস্যু বনহুর দরবারকক্ষের একটি সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট। তার সামনে দণ্ডায়মান তার কয়েকজন অনুচর। সকলেরই হাতে সুতীক্ষ্ণ বর্শা। কারো হাতে রাইফেল।

বনহুরের সামনে স্তূপাকার মালপত্র। এইমাত্র তারা ঐসব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে এসেছে। জিনিসগুলো অতি মূল্যবান।

বনহুর মালপত্রগুলো পরীক্ষা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল—এ যে দেখছি সব নতুন ঝকঝকে। কোন বিয়ের যৌতুকের জিনিসপত্র বলে মনে হচ্ছে।

একজন বলল হ্যাঁ সর্দার তাই। আমরা একটা বিয়ের বরযাত্রীর বজরায় হানা দিয়ে এসব লুট করে এনেছি।

অন্য একজন দস্যু একছড়া নেকলেস বের করে বনহুরের হাতে দিল— সর্দার, এটা নতুন বৌ এর গলা থেকে কেড়ে নিয়েছি।

নেকলেসটা হাতে নিয়েই চমকে ওঠে বনহুর, অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে— একি!

দস্যুটা মনে করে মূল্যবান নেকলেসখানা দেখে সর্দার বিস্মিত হয়েছে। সে বুক ফুলিয়ে গর্ব ভরে বলে— সর্দার, বৌটার স্বামীকে লাঠির এক আঘাতে অজ্ঞান করে দিয়েছি।

গর্জে ওঠে বনহুর— কি বললে?

হ্যাঁ সর্দার, নইলে নেকলেসখানা পাওয়া মুশকিল হত। খুব দামী ওটা।

তা আমি জানি। রহমত! রহমত! চিৎকার করে ওঠে বনহুর।

একজন দস্যু বলল— সর্দার, রহমত আমাদের দলে ছিল না। তাকে তো আপনি যাদবপুরে পাঠিয়েছেন। যাদবপুরের অন্ধ রাজা মোহন্ত সেনকে সাহায্য করতে। তিনি নাকি খুবই বিপদগ্রস্ত এবং ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই আপনার আদেশে সে যাদবপুর গেছে।

ও, রহমত তাহলে সেখানেই গেছে। কিন্তু তোমরা কার হুকুমে বজরা লুট করলে?

দলপতিগোছের অনুচরটি বলে ওঠে— আপনিই তো বলে দিয়েছেন সর্দার— যেখানে যা পাবে লুট করে আনবে।

তাই বলে --- কথা শেষ করতে পারে না বনহুর। দ্রুত পায়চারি করতে থাকে।

সর্দারকে গভীর চিন্তাযুক্তভাবে পায়চারী করতে দেখে ভীত হয় তার অনুচরগণ। না জানি তাদের কাজের মধ্যে কি দোষ খুঁজে পেয়েছে তাদের সর্দার।

হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে বলে ওঠে বনহুর— যাও তোমরা।

সর্দার এসব জিনিসপত্র কি গুদামে রাখব?

না?

কি করব?

সাগরের জলে ফেলে দাও। যাও।

দস্যুগণ বিস্মিত হল, কিন্তু সর্দারের কথায় কোনো প্রশ্ন করার সাহস হলো না ওদের। এক একজন এক একটা মাল উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর দলপতিগোছের লোকটাকে ডাকল—এই শোন।

সর্দার!

তোমার নাম কি?

অবাক হলো অনুচরটা তাদের সর্দার আজ এমন হলো কেন। তার নামটাও ভুলে গেছে। মুখ কাচুমাচু করে বলল— আমার নাম কাসেম।

এ নেকলেস কে এনেছে?

Generated by CamScanner from intsig.com

সর্দার আমি।

নেকলেসখানা ছুঁড়ে দিল বনহুর কাসেমের দিকে— এটা যার গলা থেকে কেড়ে নিয়েছ তাকে ফেরত দিয়ে এসো।

ফেরত দেব!

হ্যাঁ—যাও বিলম্ব কর না।

আচ্ছা সর্দার। নতমুখে কাসেম বেরিয়ে গেল দরবারকক্ষ থেকে। মনে তার নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল। এমন তো কোনদিন হয় না। লুটের মাল তো কোনদিনও ফেরত দেয়নি সর্দার। বিলিয়ে দিয়েছে গরিব-দুঃখীর মধ্যে। আজ এক আশ্চর্য ব্যাপার। কোথায় আবার খুঁজে পাব সেই নতুন বৌকে। ফেরত না দিলে মৃত্যু অনিবার্য। সর্দারের নিকট অপরাধীর ক্ষমা বলে কোনো জিনিস নেই। কাসেমের মুখ চূর্ণ হয়ে গেল।

সে নেকলেসখানা এনে ভেবেছিল সর্দার আজ খুব খুশি হবে। হয়তো তাকে মোটা বখশিস দেবে, কিন্তু হল বিপরীত। এখন যার নেকলেস তাকেই খুঁজে বের করে সেটা ফেরত দিতে হবে।

❑

দেশময় সাড়া পড়ে গেল— দস্যু বনহুর মাধবপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যা সুভাষিণীর বজরায় হানা দিয়ে তার সমস্ত যৌতুকের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

ব্রজবিহারী রায় স্বয়ং পুলিশ অফিসে গিয়ে ডায়রী করলেন, জামাতা মধুসেনকে আহত অবস্থায় এনে ভর্তি করে দিলেন শহরের হসপিটালে। বিয়ের রাতে এতবড় একটা অমঙ্গলে মুষড়ে পড়লেন রায়বাবু।

সুভাষিণীও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে দস্যু বনহুর এভাবে তাদের বজরায় হানা দিতে পারে।

এক সময় কথাটা মনিরার কানেও পৌঁছল। জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যার কণ্ঠ থেকে মূল্যবান নেকলেস ছিঁড়ে নিয়েছে দস্যু বনহুর, তাও শুনল সে।

মনিরার মনটা হঠাৎ রাগে— অভিমানে ভরে উঠল। ক'দিন আগেই শুনেছে, দস্যু বনহুর একজন নিরপরাধ শিকারী ভদ্রলোককে গুলী করে হত্যা করেছে। এখানে রাহাজানি, সেখানে লুটতরাজ, ওখানে নরহত্যা এসব নিয়ে যেন মেতে উঠেছে দস্যু বনহুর।

আজ প্রায় এক মাস হতে চলেছে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে মামা মামীর নিকটে পৌঁছে দিয়েছে। কই সে তো একটি দিনের জন্যও তার সন্ধান নিতে এলো না। দস্যুর মন তো এমনি নিঠুরই হয়। ওকে একটিবার দেখার জন্য মনিরা ছটফট করে চলেছে। প্রতিদিন রাতে মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে মনিরা— ঐ বুঝি এলো সে।

যখন পা ধরে আসে তখন বিছানায় এসে গা এলিয়ে দেয়। তন্দ্রায় ঘোরে সামান্য একটা শব্দ হলেও চমকে উঠে মনিরা। ছুটে আসে জানালার পাশে— কিন্তু কোথায় সে। নিশীথ রাতের দমকা হাওয়া তার বদ্ধ জানালায় আঘাত করেছিল। বিষণ্ণ মনে আবার ফিরে এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়ে ওঠে। বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। ভাবে মনিরা, চিরদিন বুঝি এমনি করে ওর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে হবে তাকে। তারপর এক সময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে সে নিজেই জানে না।

এবার আসার পর মনিরা লক্ষ্য করেছে তার মামুজান বেশ গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। আগের মত

Generated by CamScanner from intsig.com

তাকে পাশে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন না। খাবার টেবিলে তাকে না দেখলে উদগ্রীব নয়নে বারবার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন না। যতক্ষণ মনিরা টেবিলে না এসেছে ততক্ষণ চৌধুরী সাহেব খাবার মুখে দেন নি। আজ মনিরার জন্য অপেক্ষা করেন না। এখন খাবার টেবিলে ওকে না দেখলেও মরিয়ম বেগমকে কোন প্রশ্ন করেন না। আপন মনে খেয়ে বেরিয়ে যান।

মনিরার ওপর স্বামীর এই উদাসীনতা লক্ষ্য করে মরিয়ম বেগম অন্তরে ভীষণ আঘাত পেতেন। একটা গভীর বেদনা তাকে নিষ্পেষিত করে চলত। মাতা-পিতাহারা অসহায় মেয়েটি যে আজ পর্যন্ত তাঁদের মুখ চেয়েই বেঁচে আছে, আজ যদি তাঁরাই ওর প্রতি বিরূপ হন, তা হলে সে বাঁচবে কি করে।

মনিরার ওপর চৌধুরী সাহেবের এই বিদ্রূপ মনোভাব শুধু মরিয়ম বেগমকে ব্যথিত করেনি, মনিরাও ভীষণ দমে গেছে। মরমে যেন মরে গেছে সে। সেদিন যখন মিঃ হারুনের সঙ্গে এ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো মনিরা—মামুজানের অন্ধকার মুখমণ্ডল দেখে মুহূর্তে তার সমস্ত হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মনিরা মামুজানের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার সাহস করেনি। কোন দিন হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে সে।

কিন্তু মনিরার তো কোন দোষ নেই। নিষ্পাপ ফুলের মত এখনও সে পবিত্র।

চৌধুরী সাহেব মনিরাকে যতই দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলেন, মরিয়ম বেগম ততই ওকে গভীর স্নেহের আবেষ্টনীতে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন এতটুকু মুখ ভার দেখলে মরিয়ম বেগম অস্থির হয়ে পড়তেন—কি হয়েছে মা? শরীর ভাল আছে তো? মাথা ধরেছে বুঝি? এমনি নানা প্রশ্নে মনিরাকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন তিনি।

মনিরা জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী— সব বুঝতো সে। মামীমা তার অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান, বাইরের কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা মনিরার মনকে যেন বিষাক্ত করে তুলতে না পারে অবিরত সে চেষ্টাই করতেন মরিয়ম বেগম।

মামীমার প্রাণঢালা স্নেহ-ভালবাসা মনিরার অতৃপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিলেও মামুজানের উপেক্ষা তাকে মর্মাহত করে তুলত। আড়ালে বসে চোখের পানি ফেলত সে।

নিজের অদৃষ্টকে নিজেই ধিক্কার দিত মনিরা। না হলে এত ছোট বেলায় মা-বাবাকে হারাবে কেন? আজ সে বিশাল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। একদিকে তার মাতা-পিতার অগাধ ধন-সম্পদ অন্যদিকে মামা-মামীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য— এত থেকেও আজ সে চির দুঃখিনী— হতভাগিনী।

যদি তার অদৃষ্ট মন্দই না হবে, তাহলে মনিরই বা হঠাৎ নদীর পানিতে হারিয়ে যাবে কেন? হারিয়েই যদি গেল তবে আবার সে তার জীবন পথে স্বাভাবিকভাবে ফিরে না এসে অস্বাভাবিকভাবে ফিরে এলো কেন?

বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে মনিরা। অথৈ সাগরে যেন কোন সম্বল পায় না সে আঁকড়ে ধরার। যত রাগ, যত অভিমান হয় মনিরের ওপর। কেন, ইচ্ছে করলে সে কি সৎপথে আসতে পারে না? তাহলেই তো মনিরার কোন দুঃখ বেদনাই থাকে না। হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ যেন তার পিঠে হাত রেখেছে বলে মনে হল তার।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল মনিরা। তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। তার মনির এসেছে তার পাশে।

মনিরা কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বনহুর মনিরার মাথায় হাত রেখে বলে— মনিরা, একি কাঁদছ কেন?

না না, তুমি যাও। তুমি যাও।

মনিরা, কি হল তোমার?

কিছু না।

অনেকদিন পরে এলাম তোমার হাসিভরা মুখ দেখব কিন্তু ..

তুমিই আমার জীবনটা দুর্বিসহ করে তুলেছ। তুমি আমায় হাসতে দিলে না মনির।

জানো, আজ আমার হৃদয়ে কি অসহ্য ব্যথা গুমরে কেঁদে মরছে? শুধু তোমার জন্য আজ আমি মনে এতটুকু শান্তি পাচ্ছি না। কিসের অভাব তোমার--- তবু কেন তুমি এসব করছ? কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মনিরা।

তা পারবে কেন, তুমি যে দস্যু— ডাকু ..

এ তো পুরনো কথা।

আচ্ছা, চিরদিন কি তুমি এসব করবে? চুরি-ডাকাতি লুটতরাজ ছাড়া আর কি কোন কাজ নেই তোমার?

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে বনহুর।

মনিরা, তাড়াতাড়ি দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে বনহুরের মুখে চাপা দেয়— থাম।

মনিরা অভাবের তাড়নায় আমি এসব করি না। এসব আমার নেশা।

নরহত্যা তোমার নেশা?

দস্যু বনহুর কোনদিন বিনা কারণে নরহত্যা করে না।

একটা নির্দোষ বেচারী শিকারী ভদ্রলোককে তুমি হত্যা করনি?

মাধবপুরের জমিদারের কন্যার কণ্ঠ থেকে তুমি হার ছিঁড়ে নাওনি?

আমি নেইনি, নিয়েছে আমার অনুচরগণ।

সে তোমার আদেশেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ একটা সামান্য হারের জন্য তুমি...

মনিরা— সে হার তাকে ফেরতে পাঠানো হয়েছে।

নিলেই বা কেন আবার ফেরতই বা পাঠালে কেন?

সব কথা তুমি নাইবা শুনলে।

শুনতে আমি চাই না। শুধু বল, তুমি আর ওসব করবে না। বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে মনিরা।

বনহুর পূর্বের ন্যায় হেসে ওঠে— হাঃ হাঃ হাঃ!

মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে তার বুকে— আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না মনিরা, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না..

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে, তারপর বলে— মনিরা, নারী হৃদয় বড়ই কোমল। শুধু কোমল নয়, দুর্বলও। তাই তুমি সামান্য কিছু হলেই সহ্য করতে পার না।

কি বললে, তোমার কাজ সামান্য! রাহাজানি, লুটতরাজ, নরহত্যা— এসব— সামান্য?

নয়তো কি? দস্যু বনহুরের কাছে এসব অতি নগণ্য। জানো মনিরা, এই মুহূর্তে আমি নিজের বুকে গুলী চালাতে পারি!

তুমি সবই পার--- পাষণ্ড, তুমি সব পার। কিন্তু সে ব্যথা যে আমার কাছে কত দুর্বিষহ তা জানো না। প্রতি মুহূর্তে তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমি যে কত অস্থির থাকি, তুমি তা জানো না।

মনিরা, এই হতভাগার জন্য কেন তুমি চিন্তা কর। কেন তুমি ভাব?

নিষ্ঠুর! সত্যাই তোমার হৃদয় পাষাণে গড়া। জানো না তুমি তোমার মনিরার কতখানি।

Generated by CamScanner from intsig.com

কণ্ঠরোধ হয়ে আসে মনিরার।

বনহুর অবেগমধুর কণ্ঠে ডাকে— মনিরা!

বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে মনিরা— আর কত দিন আমাকে এমনি করে কাঁদাবে তুমি? তুমি তো ঐ সব নিয়ে মেতে থাক, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকি বল?

আম্মা-আব্বার সেবা-যত্নের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিও, শান্তি পাবে।

তা জানি কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার সব অন্ধকার।

তুমি নিতান্ত বালিকার মত কথা বললে মনিরা। দস্যু বনহুরকে তুমি মায়ার বাঁধনে বাঁধতে চাও। কিন্তু তা কোন দিনই হবার নয় মনিরা।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা— কি বললে? আমার সমস্ত আকাশ কুসুম ধূলিসাৎ করে দিলে। মুছে দিলে আমার হৃদয়ের সমস্ত বাসনা। ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল মনিরা মেঝের কার্পেটে, উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

বনহুর কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর মনিরার পাশে এসে বসল, পিঠে হাত রেখে ডাকল— মনিরা! আবার ডাকল সে— মনিরা, তুমি যা চাও— তাই পাবে। ওঠো মনিরা—

মনিরা ধীরে ধীরে কার্পেট থেকে উঠে বলল— সত্যি দেবে?

কি চাও তুমি?

তোমাকে।

আমি তো তোমারই।

মনির!

হাঁ মনিরা।

মনিরা বনহুরের চোখ দুটির দিকে স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল। এমন করে কোনদিন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেনি।

দূর থেকে ভেসে আসছে মোরগের কণ্ঠস্বর। ভোর হবার আর বেশি দেরী নেই।

বনহুরকে বিদায় দিয়ে মনিরা শয্যায় গা এলিয়ে দিল। একটা অনাবিল আনন্দ মনিরার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাকে মুছে নিয়ে গেছে। মনির আর কারও নয়— শুধু তার।

❑

সেদিনের পর থেকে নূরীর মনের শান্তি চিরতরে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। লজ্জায়-অভিমানে নূরী আজ পর্যন্ত বনহুরের সম্মুখে আসেনি। অসহ্য একটা দাহ তার অন্তরে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছিল। বনহুরকে নূরী শুধু ভালবাসতো তা নয়, তার জীবনের সাথী হিসাবে ওকে সে গ্রহণ করেছিল। গোটা পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাক, তবু নূরী ওকে ভুলবে না— ভুলতে পারে না।

নূরী যদিও এতদিন বনহুরের সামনে আসেনি, তবুও সে একটি দিনও ওকে না দেখে থাকতে পারেনি। প্রতিদিন সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটি বারের জন্য বনহুরকে দেখে যেত। যতক্ষণ বনহুর বাইরে থেকে ফিরে না আসত ততক্ষণ নূরী ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করত ওর। বনহুর ফিরে এলে তাকে একটি বারের জন্য দেখে এসে তবেই সে শয্যা গ্রহণ করতো।

একদিন বনহুর সকালে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এলো না। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল তবু

Generated by CamScanner from intsig.com

তার দেখা নেই। নূরী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল না জানি কোন বিপদে পড়েছে সে! ব্যস্ত হয়ে বারবার অনুচরদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল কোথায় গেছে বনহুর। আর কে গেছে তার সঙ্গে। এতক্ষণ ফিরে এলো না কেন? নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তুলল নূরী সবাইকে।

অনুচরগণ নূরীর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে হাসল, একজন বলল— সর্দার কচি বাচ্চা নয়— হারিয়ে যাবে না।

নূরী রাগের বশে তাকে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল। তারপর গট গট করে চলে গেল নিজের কক্ষে।

দস্যু বনহুরের অনুচর সে। একটা নারীর হাতের চড় খেয়ে নিশ্চুপ থাকবে। রাগে অধর দংশন করলো। অনুচরটির নাম হাংলু। জাতিতে সে ছিল পাঠান। যেমন রাগী, তেমন দুঃসাহসী।

নূরীর চড় খেয়ে রাগ তার চরমে উঠল। নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁত পিষল সে।

নূরী কিন্তু নিজের কক্ষে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না। বনহুরের জন্য মনটা তার ছটফট করতে লাগল।

ক্রমে রাত বেড়ে এলো। এক সময় বিছানার কোলে আশ্রয় নিল নূরী। নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল সারাটা দিনের অবসাদ আর ক্লান্তি তাকে টেনে নিয়ে গেল বিস্মৃতির পথে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো নূরী— জ্যোস্না প্লাবিত রাত। বনানী ঢাকা ঝরণার পাশে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে বনহুর। নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে আংগুল বুলিয়ে দিচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাস অজানা ফুলের সুরভি নিয়ে তাদের জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। ফুটফুটে জ্যোস্নার আলোতে বনহুরকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল গভীর নীল দুটি চোখে মায়াময় চাহনি। বনহুর নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নূরী হেসে বলে— হুর, অমন করে কি দেখছ?

বনহুর দু'হাতে নূরীর গলা বেষ্টন করে বলে— তোমাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশে ঘনিয়ে আসে একরাশ কালো মেঘ। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে পূর্ণিমার চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখখানা নূরীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। নূরীর কোলে বনহুর শুয়ে আসে তবু সে তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না— নূরীর হাত দিয়ে বনহুরের মুখখানা অনুভব করার চেষ্টা করে।

হঠাৎ শুরু হয় ঝড়, বৃষ্টি, তুফান। আকাশে মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের কড়কড় ধ্বনি। নূরী আর বনহুর, সেই তুফানের মধ্যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নূরী ব্যাকুল আগ্রহে ডাকে—হুর— হুর কোথায় তুমি। হুর-তুমি কোথায়— ঝড়ের মধ্যে দু'হাত প্রসারিত করে খুঁজতে থাকে সে বনহুরকে।

গাছের ডাল ভাঙছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। নূরী আকুলভাবে খুঁজে চলেছে বনহুরকে। কখনও গাছের গুঁড়িতে আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়েছে। কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। প্রাণফাটা চিৎকার করে শুধু ডাকছে— হুর—হুর, কোথায় তুমি— কোথায় তুমি— হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলো। স্বচ্ছ আকাশের বুকে হেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। নূরী উম্মাদিনীর ন্যায় বনহুরের সন্ধানে চারদিকে তাকাল। একি, ঐ তো তার প্রাণাধিক।

স্বচ্ছ নীল আকাশে ঠিক চাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন তারই মত সুন্দরী যুবতী— এলোমেলো চুল, অশ্রুসিক্ত নয়ন, দু'হাত মেলে বনহুরকে ডাকছে।

বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সেই যুবতীর দিকে। দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে বনহুর।

Generated by CamScanner from intsig.com

কি স্বপ্ন দেখেছিল সে। গোটা শরীর ঘামিয়ে উঠেছে। গলাটা কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখের পানিতে বালিশটা ভিজে চুপসে উঠেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে নূরী। স্তব্ধ হয়ে ভাবে স্বপ্নের কথা। টনটন করে ওঠে বুকের ভেতরটা। সত্যি কি তবে হুর এমনি করে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। না না, তা হতে পারে না। নূরীর জীবনের একমাত্র সম্বলই হুর। ওকে ছাড়া নূরী বাঁচতে পারে না। কিন্তু কাল সে তো ফিরে আসেনি। এখনও ফিরে এসেছে কিনা কে জানে?

নূরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে এগুলো বনহুরের কক্ষের দিকে।

কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল নূরী, কক্ষে আলো জ্বলছে। অনেকটা আশ্বস্ত হল— যাক, তাহলে হুর ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, এখন নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে ঘুমোবে। কিন্তু ওকে একটিবার না দেখে ফিরে যেতে পারল না নূরী। মনটা বড় অস্থির হলো, দরজা ঠেলে উঁকি দিল ভেতরে।

আলোটা দপ দপ করে জ্বলছে।

একি, বিছানায় অর্ধ শায়িত অবস্থায় বনহুর শুয়ে আছে। এত রাতেও ঘুমায়নি সে। নূরী ধীরে ধীরে মুখটা ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ হলো। নূরী চমকে উঠল— এবার সে ধরা পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই হুর ছুটে আসবে। ছিঃ ছিঃ! কি ভাববে হুর। কিন্তু কই হুরতো ছুটে এলো না। তবে কি সে শুনতে পায়নি। তা কেমন করে হয়, শব্দটা বেশ জোরেই হয়েছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে হুর, নইলে সে এমন নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

নূরী এবার অতি সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করল। লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো বনহুরের বিছানার পাশে। কালো পাগড়ীটা শুধু খুলে রেখেছে টেবিলে আর রিভলভারখানা। অন্যান্য ড্রেস এখনও বনহুরের শরীরে পরা রয়েছে এমন কি জুতো জোড়াও রয়েছে তার পায়ে।

নূরী অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল বনহুরের নিদ্রিত মুখমণ্ডলের দিকে। বালিশের উপরে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে সে, দক্ষিণ হাতখানা বুকের উপর। বাম হাতখানা একপাশে। পা দু'খানা অর্ধঝুলিত অবস্থায় রয়েছে।

নূরী ভুলে গেল, বনহুরের কাছ থেকে সে এখন দূরে সরে রয়েছে। ভুলে গেল রাগ অভিমান। অতি ধীরে ধীরে বনহুরের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে রাখল তারপর সন্তর্পণে পা দু'খানা রাখল খাটের ওপরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর নিদ্রা ছুটে গেলো, চমকে উঠে বসল। উজ্জ্বল আলোতে দেখল নূরী দাঁড়িয়ে আছে তার খাটের পাশে। বনহুর নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সব।

নূরী, এবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

বনহুর ডাকল– নূরী।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নূরী। কিন্তু ফিরে তাকাবার সাহস পেল না সে।

বনহুর ডাকল– শোন নূরী।

নূরী ধীর পদক্ষেপে বনহুরের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টি নত রয়েছে ওর।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল– বসো।

নূরী তবুও বসল না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল!

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ডাকল– নূরী!

এতক্ষণে নূরী চোখ তুলে একবার বনহুরের দিকে তাকাল, পুনরায় দৃষ্টি নত করতে যাচ্ছিল সে বনহুর ওর চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করে ধরে— উঁ হুঁ আমার দিকে তাকাও। বল, কেন তুমি এখানে এসেছিলে?

নূরী নীরব।

Generated by CamScanner from intsig.com

বনহুর ওকে টেনে বসিয়ে দেয় নিজের পাশে, তারপর হেসে বলে– পাগলী, আমার উপর রাগ করে খুব কষ্ট পেয়েছ, না?

নূরী এবারও নিশ্চুপ।

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে— কই, আগের মত আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিলে না?

নূরী আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না— হঠাৎ দু'হাতের মধ্যে মুখ রেখে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠে।

বনহুর আশ্চর্য কণ্ঠে বলে—একি, আবার কেন কাঁদছ?

না না, তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না হুর, জিজ্ঞাসা কর না।

তোমরা নারীজাতি, শুধু কাঁদতেই জানো, শুধু কান্না আর কান্না, এ ছাড়া আর কিছুই নেই তোমাদের?

হুর, তোমাকে ভালবেসে কান্না ছাড়া আর যে কোন পথ নেই।

নূরী, আমার কি জন্ম শুধু তোমাদের কাঁদাবার জন্য? যেদিকে তাকাই শুধু চোখের পানি আর চোখের পানি! শিশুকালে মা- বাবাকে কাঁদিয়েছি। তাই বুঝি আমার জীবনে এ একটি চরম অভিশাপ। যে দিকে তাকাই শুধু কান্নাই দেখতে পাই। কান্না ছাড়া কেউ যেন হাসতে জানে না।

হুর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সে দিন তোমার কাছে যে অপরাধ আমি করেছি, জানি তার ক্ষমা নেই, তবু বল তুমি আমাকে.............

অনেক হয়েছে! নূরী, দস্যু কোনদিন রাগ-অভিমান জানে না, যা যখন ঘটে তখনই তার শেষ হয়। তোমার কোন দোষ নেই।

হুর! নূরী বনহুরের বুকে মাথা রাখল। একটা অন্ধকার কালো মেঘ ধীরে ধীরে নূরীর মন থেকে সরে গেল। কতদিন নূরী এমনি করে বনহুরের বুকে মাথা রাখতে পারেনি। একটা অনাবিল আনন্দ তার সমস্ত হৃদয়ে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

নূরী যখন বনহুরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো, তখন অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়াল।

নূরী এগিয়ে চলেছে তার ঘরের দিকে। কিছু পূর্বে যে ব্যথার আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, এখন তা আর নেই। ধুয়ে-মুছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। বনহুরের একটা কথায় সব ভুলে গেল নূরী।

নূরী এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে তার এগিয়ে চলেছে একটা ছায়ামূর্তি। যেমনি নূরী নিজের কক্ষে প্রবেশ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে নূরীকে ধরে ফেলল একটা বলিষ্ঠ লোক। নূরী চিৎকার করার পূর্বেই লোকটা তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কাঁধে উঠিয়ে নিল, তারপর অন্ধকারে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

বনহুর বিছানায় শুয়ে হঠাৎ শুনতে পেল তাদের আস্তানা থেকে একটা অশ্ব-পদশব্দ যেন দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। এ অসময়ে কে তাদের আস্তানা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে? ব্যাপারটা তার কাছে স্বচ্ছ মনে হল না। বনহুর বিছানায় সোজা হয়ে বসল, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

এমন সময় একজন অনুচর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল- সর্দার, সর্দার......

বনহুর তড়িৎ গতিতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল তারপর টেবিল থেকে রিভলভারখানা তুলে নিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল– কে, মহসীন?

সর্দার, হাংলু নূরীকে নিয়ে ভেগেছে... ঐ শুনা যাচ্ছে তার ঘোড়ার খুরের শব্দ।

Generated by CamScanner from intsig.com

তোমরা দেখেছ, বাধা দাওনি?

সর্দার, আমরা দু'জনে পাহারায় ছিলাম, বাধা দিতে গেলে একজনকে হাংলু হত্যা করছে ...

বনহুর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না, ছুটে বেরিয়ে যায়— সে অশ্বালয়ের দিকে। গেটের পাশেই দেখতে পায় তার নিহত অনুচরটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। একখানা ছোরা আমূল বসিয়ে দেওয়া রয়েছে তার বুকে।

বনহুরের এসব দেখার সময় নেই। একবার মাত্র তাকিয়ে দেখে নিয়ে অশ্বালয়ে প্রবেশ করে। অতি দ্রুত তাজকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর চেপে বসে তাজের পিঠে।

হাংলুর অশ্ব পদশব্দ ততক্ষণে অনেক দূরে সরে গেছে।

বনহুর তাজের পিঠে উল্‌কাবেগে ছুটল। চোখ দু'টি দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। নূরীকে নিয়ে হাংলু পালিয়েছে, এতবড় সাহস তার! বনহুর দাঁতে অধর চেপে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করে। এইবুঝি সে প্রথম তাজের পিঠে কষাঘাত করল।

তাজ বুঝতে পারে তার মুনিব আজ প্রকৃতিস্থ নয়। কাজেই নিজের গতি আরও বাড়িয়ে দেয়, সে।

রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে তাজ ছুটে চলেছে। পূর্বের অশ্ব-পদশব্দ অতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বনহুর বারবার তাজের পেটে পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। জোরে, আরও জোরে ছুটতে লাগল তাজ।

▢

হাংলু নূরীকে এঁটে ধরেছিল।

নূরী যতই হাংলুর হাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল ততই হাংলুর বলিষ্ঠ হাতখানা তার দেহে সাঁড়াশীর মত বসে যাচ্ছিল। প্রাণফাটা চিৎকার করে মাঝে মাঝে ডাকছিল - ---- হুর --হুর--

নূরীর চিৎকারে গহন বনের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছিল। বনের পশু-পক্ষী পর্যন্ত সচকিত হয়ে উঠেছিল। নূরীকে নিয়ে হাংলু একটা প্রান্তরে এসে পড়ে।

চারদিক ধু ধু মাঠ। কোথাও আগাছা বা ঝোপঝাড়ের চিহ্ন নেই। নূরীকে চেপে ধরে হাংলু অশ্ব চালনা করছে। সরীসৃপের মত সরু একটা রাস্তা আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে দূরে। সে সরু পথ ধরে হাংলু অশ্ব চালাচ্ছিল।

বনহুরের অশ্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই হাংলুর অশ্বের নিকটবর্তী হল। যদিও বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, প্রান্তরের মধ্যে এসে অন্ধকারটা বেশ অনেকখানি হালকা হয়ে এসেছে। বনহুর দেখতে পেল, অন্ধকারের প্রান্তরের বুক চিরে একটা অশ্ব দ্রুত সামনে এগোচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারল, এটাই হাংলুর অশ্ব এবং অশ্বপৃষ্ঠে হাংলুর কঠিন বাহু বন্ধনের মধ্যে রয়েছে নূরী। নইলে বনহুরের রিভলভার এতক্ষণে গর্জন করে উঠত।

বনহুরের অশ্ব-পদশব্দও হাংলুর কানে পৌঁছে ছিল। একবার মাত্র পেছনে তাকিয়ে দেখেছিল সে। তারপর প্রাণপণে অশ্ব চালনা করতে লাগল। মরিয়া হয়ে ছুটেছে সে।

বনহুরের অশ্বও উল্কাবেগে ছুটে আসছে তার দিকে। সেকি অদ্ভুত গতি তাজের।

হাংলু প্রাণ ভয়ে অশ্বচালনা করছে। বনহুর তাকে ক্ষমা করবে না। নূরীকে চুরি করার

Generated by CamScanner from intsig.com

অপরাধে তাকে গুলী করে হত্যা করবে।

বনহুর হিংস্র জন্তুর ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটছে। এই মুহূর্তে হাংলুকে সে কুকুরের মত গুলী করে হত্যা করবে।

তীর বেগে ছুটে আসছে বনহুর। নিঃশ্বাস তার দ্রুত বইছে। মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে। নিকটে অতি নিকটে এসে পড়েছে বনহুর।

বনহুর তাজকে নিয়ে হাংলুর অশ্বের পাশে পৌছে গেল, এক ঝট্‌কায় হাংলুকে টেনে মাটিতে ফেলে দিল।

হাংলু পড়ে যেতেই নূরী বনহুরের বুকে ঝাপিয়ে পড়ল।

বনহুর নূরীকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিল। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে তাকাল হাংলুর দিকে।

হাংলুর মুখমণ্ডল তখন বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণ হাংলুর মধ্যে যে একটা হিংস্র ভাব জেগেছিল মুহূর্তে তা অদৃশ্য হল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলো। হাতজোড় করে দাঁড়াল সে।

বনহুর নূরীকে সরিয়ে দিয়ে কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। হাংলুর দিকে– শয়তান!

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে হাংলু– মাফ করুন সর্দার।

দাঁতে দাঁত পিষলো বনহুর। তারপর রিভলভার উঁচু করে ধরল, পরমুহূর্তেই বনহুরের রিভলভার গর্জন করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হাংলুর রক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়ল প্রান্তরের মধ্যে

নূরী ছুটে এসে বনহুরের হাত চেপে ধরল—একি করলে হুর।

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে বলল—চলো নূরী।

নূরীকে নিজের অশ্বপিঠে চাপিয়ে নিজেও উঠে বসল। ফিরে চলল এবার তারা আস্তানার দিকে।

পেছনে প্রান্তরের মধ্যে পড়ে রইল হাংলুর মৃতদেহ। পাশে দাঁড়িয়ে হাংলুর অশ্ব।

প্রান্তর ছাড়িয়ে এবার বনহুর আর নূরী তাজের পিঠে গহন বনের মধ্যে প্রবেশ করল।

নূরীর মনে আজ অফুরন্ত আনন্দ!

হুর যদি তাকে ভালই না বাসবে, তবে তার জন্য এত উদ্বিগ্ন হবে কেন? তাকে বাঁচানোর জন্য বনহুরের সেকি প্রাণঢালা প্রচেষ্টা।

নূরী নিজেকে বিলিয়ে দিল বনহুরের মধ্যে।

❑

শহরের বিশিষ্ট নাগরিক বণিক ভগবৎ সিং তার রাজ প্রাসাদ সমতুল্য বাড়িতে আজ একটা পার্টি দিচ্ছে। সম্প্রতি তিনি বাণিজ্যস্থল থেকে দেশে ফিরেছেন। শহরের গণ্যমান্য সকলকেই ভগবৎ সিং পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার কাছে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই এ পার্টিতে যোগ দেবে।

ভগবৎ সিং পুলিশ অফিসারগণকেও এ পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছেন? মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন, এমন কি মিঃ জাফরীও আসবেন এ পার্টিতে। মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলমকেও দাওয়াত করেছেন তিনি।

খানবাহাদুর হামিদ খান, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন, ডাক্তার জয়ন্ত সেন, এমন কি চৌধুরী

Generated by CamScanner from intsig.com

সাহেব পর্যন্ত বাদ পড়েন নি। সন্ধ্যা আটটার পর পার্টি শুরু হবে।

ভগবৎ সিং বিকেলে আর একবার পুলিশ অফিসে গিয়ে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনকে নিয়ে মিঃ জাফরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি নিশ্চয়ই যাবেন বলে কথা দিলেন তাকে।

সন্ধ্যার পর থেকেই আমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের আগমন শুরু হল। বিরাট হলঘরটার মধ্যে খাবার আয়োজন করা হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমণ্ডলীতে হলঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। নানারকম হাসি-গল্পতে ভরে উঠল চারদিক। এখনও পুলিশ অফিসারগণ আসেন নি।

মিঃ চৌধুরী এসেছেন– খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর কেউ বাদ যায়নি, সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। এমন সময় মিঃ জাফরী অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে ভগবৎ সিং অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের আনলেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা অতিথিও এসেছেন এ পার্টিতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলে খাবার দেওয়া হল। নানারকম খাদ্য-সম্ভারে ভরে উঠল খাবার টেবিল। মিঃ জাফরী আজ ভগবৎ সিং-এর অতিথি, এটা কম কথা নয়।

খাওয়ার পর্ব প্রায় শেষ হবার পথে, এমন সময় চৌধুরী সাহেব অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে।

মুহূর্তে কক্ষে আলোড়ন শুরু হল। ভগবৎ সিং ছুটে এলেন ওপাশ থেকে। তিনি অতিথিগণের খাওয়া দাওয়ার তদারক করছিলেন। চৌধুরী সাহেব মেঝেতে পড়ে যেতেই মিঃ ভগবৎ সিং চৌধুরী সাহেবের মাথাটা তুলে নিলেন কোলে।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারও এসে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেবের চারপাশে।

ডাক্তার জয়ন্ত সেন চৌধুরী সাহেবের পাশেই বসে খাচ্ছিলেন। তিনি হাতখানা তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কার করে নিয়ে চৌধুরী সাহেবের পাশে বসে পড়লেন। চৌধুরী সাহেবের হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মিঃ আলম একবার ডাক্তার জয়ন্ত সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। চৌধুরী সাহেবের মুখ দিয়ে তখন ফেনাযুক্ত লালা গড়িয়ে পড়ছে।

মিঃ হারুন ঝুঁকে পড়ে বললেন– একি হল? হঠাৎ চৌধুরী সাহেবের হল কি!

ভগবৎ সিং তো হায় হায় করতে শুরু করলেন। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে লক্ষ্য করে বলেন– ডাক্তার বাবু, দেখুন। আপনি একটু ভাল করে দেখুন ভদ্রলোকের হল কি!

মিঃ আলমের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে, কঠিন কণ্ঠে বলেন— চৌধুরী সাহেবকে বিষ পান করানো হয়েছে।

অদ্ভুদ শব্দ করে উঠলেন মিঃ হারুন– বিষ!

মিঃ হোসেন বললেন– দেখছেন না চৌধুরী সাহেবের মুখ দিয়ে কেমন ফেনাযুক্ত লালা গড়িয়ে পড়ছে। বিষ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এ বিষ তার খাবারে কেমন করে এলো। কথাটা বলেন মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ জাফরী কট্‌মট্‌ করে তাকালেন ভগবৎ সিং-এর দিকে। তারপর গর্জন করে উঠলেন– সিং বাহাদুর, আপনার বাড়িতে খাবার খেতে এসে চৌধুরী সাহেবের এ অবস্থা। কাজেই এজন্য আমি আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করছি।

ডাক্তার জয়ন্ত সেন বললেন– না না, উনার কোন দোষ নেই। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে একই খাবার আমরা কয়েকজন মিলে এক টেবিলে খাচ্ছিলাম। খাবারে বিষ মেশানো থাকলে আমাদের কয়েকজনের অবস্থা এতক্ষণ চৌধুরী সাহেবের মতই হত।

Generated by CamScanner from intsig.com

তাহলে চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ এলো কোথা থেকে।

পুনরায় মিঃ জাফরী হুঙ্কার ছাড়লেন।

সমস্ত হলঘরে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কার মুখে কথা সরছে না। হতভম্বের মত তাকাচ্ছেন পুলিশ অফিসারদের মুখের দিকে।

শেষ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে বললেন ভগবৎ সিং চৌধুরী সাহেবকে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তিনি এসবের কিছুই জানেন না।

এদিকে কয়েকজন ভদ্রলোক ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। চৌধুরী তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

ডাক্তারগণ প্রাণপণে চৌধুরী সাহেবকে আরোগ্য করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু সকল আশা বিফল হল। ডাক্তারদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় ভরে উঠল। চৌধুরী সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হলেন ।

সবাই যখন চৌধুরী সাহেবের লাশ ঘিরে ধরে নানারকম আলোচনা করছেন, তখন সকলের অলক্ষ্যে মিঃ আলম বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে।

খবর পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চৌধুরী বাড়ি থেকে ছুটে এলেন সরকার সাহেব এবং মরিয়ম বেগম। মনিরাও এলো তাদের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে কক্ষে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, এক্ষণে সে কক্ষে কান্নার রোল উঠল। মরিয়ম বেগম স্বামীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

মনিরা তো মামুজানের মুখে-বুকে হাত বুলিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। পিতামাতাকে হারানোর পর এই মামা-মামীই ছিল তার সম্বল। মামাকে হারিয়ে মনিরা আজ চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগল।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না।

তিনি চৌধুরী সাহেবের শিহরে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ ঢেকে ছোট্ট বালকের মত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সরকার সাহেব আজ ত্রিশ বছর পর্যন্ত চৌধুরী বাড়িতে হিসাব নিকাশের কাজ করে আসছেন। চৌধুরী সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক তিনি। সরকার সাহেবই চৌধুরীবাড়ির সর্বক্ষণ দেখাশোনা করতেন। এমনকি বাজারের হিসাবটাও ছিল সরকার সাহেবে হাতে। চৌধুরী সাহেব ভুলেও কোনদিন সরকার সাহেবের নিকট হতে কোনো হিসাব-নিকাশ নিতেন না। তার উপরেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন চৌধুরী সাহেব।

সরকার সাহেবও চৌধুরী সাহেবকে নিজ বড় ভাইয়ের মতই মনে করতেন। চৌধুরী সাহেবের অজ্ঞাতে তিনি কোনদিন একটা পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করতেন না।

এসব কারণেই উভয়ের মধ্যে ছিল একটা নিগূঢ় ভ্রাতৃসম্বন্ধ। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সরকার সাহেবের অস্থিপাঁজর যেন চূর্ণ করে দিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত মিঃ জাফরী লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং যতক্ষণ আসল দোষী ধরা না পড়ে ততক্ষণ ভগবৎ সিং এর উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিলেন।

Generated by CamScanner from intsig.com

... বেগম এবং মনিরা অসহায়ের মত আকুল হয়ে কাঁদছেন। আজ তারা ... একমাত্র তাদের সম্বল ছিলেন চৌধুরী সাহেব। তিনিই আজ চলে গেছেন—শুধু ... বিরহ নিয়ে গেছেন। আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।

... বেগম ও মনিরা চৌধুরী সাহেবের শোকে এতই কাতর হয়ে পড়েন যে, সরকার ... আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা দিয়েও তাদের দু'জনকে এতটুকুও শান্ত পর্যন্ত করতে ...

... বহু লোকজন এলেন চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। সবাই চৌধুরী ... মৃত্যুতে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারও চোখ শুষ্ক রইল না। চৌধুরী সাহেবের এ ... মৃত্যুতে গোটা শহরে একটা শোকের ছায়া পড়ল লোকের মুখে মুখে কাগজে কাগজে ... খবর।

চৌধুরী সাহেবের লাশ যখন জানাযার জন্য বাড়ির সম্মুখস্থ বাগানে রাখা হলো, তখন অসংখ্য ... সকলের অলক্ষ্যে আর একজন এসে দাঁড়াল গোলাপঝাড়ের পাশে চৌধুরী সাহেবের ... নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছিল সে।

... শেষ হয়ে যায়। কখন যে চৌধুরী সাহেবের লাশ নিয়ে চলে গেছে খেয়ালও নেই ... সম্বিত ফিরে পায়, কঠিন পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখমন্ডল! দাঁতে অধর ... দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়– চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে ... সাজা সে নিজ হাতে দেবে।

... সকলের অলক্ষ্যে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে, তেমনি সকলের অজ্ঞাতে বাগান ... লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হল। শুধু একটা তৃপ্ত নিঃশ্বাস ঘুরপাক খেয়ে ঘুরতে ... বাগানটার মধ্যে।

গভীর রাত।

... শহরী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। যানবাহন চলাচল একরকম প্রায় থেমে এসেছে। ... দু'একটা মোটরকার এদিক থেকে সেদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে।

রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলো নিঝুম পুরীর মত ঝিমিয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই ... দু'একজন পথিক পথ চলছে।

এমন সময় একটি শব্দবিহীন মোটরকার এসে থামল চৌধুরী বাড়ির গেটে।

... বারান্দায় বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। গাড়ির শব্দ পেয়ে পাহারাদার সজাগ হয়ে উঠল, ... এত রাতে গাড়ি এলো কোথা হতে।

দারোয়ান কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই গাড়ির চালক একটি কার্ড বের করে দারোয়ানের হাতে ... বলল—... সাহেবকে ডেকে দাও।

তিনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

... তুমি যাও।

দারোয়ান বলল– তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাছাড়া তিনি এত রাতে কারও সঙ্গে দেখা করেন ...

দারোয়ান জোর গলায় কথাটা বলে উঠে।

যাবে না তুমি?

Generated by CamScanner from intsig.com

তবে গেট খুলে দাও।

হুকুম নেই। গেট আমি খুলব না।

বেশ। চালক ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ায় গাড়ির দিকে। দারোয়ানও ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় অমনি চালক পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরে, তারপর মুখের মধ্যে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে টেনে তুলে ফেলে গাড়ির মধ্যে।

দারোয়ানের হাতে ছিল গুলীভরা বন্দুক, তবু সে একটু নড়তে পারল না বা টু শব্দ করতে সক্ষম হলো না। চালক ওকে একটা দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে গাড়ির মেঝেতে শুইয়ে রাখল, তারপর দারোয়ানের পকেট থেকে গেটের চাবি নিয়ে গেট খুলে ফেলল।

গাড়ি-বারান্দায়, গাড়ি রেখে চালক নেমে পড়লো। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে। পাহারাদার এবং চাকর-বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শোকাতুরা মরিয়ম বেগম কেঁদে কেঁদে এখন মৃতের ন্যায় অসাড় হয়ে পড়েছেন। শিয়রে বসে মনিরা তখনও জেগে নীরবে চোখের পানি ফেলেছে। কতদিনের কত কথা আর কত স্মৃতি মনে উদয় হচ্ছে। পিতৃসমতুল্য চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু তাঁর সমস্ত হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সংসারে আপনজন বলতে তার ঐ মামুজান আর মামীমা ছাড়া আর কেউ নেই।

যতই মনিরা চৌধুরী সাহেবের কথা স্মরণ করছে, ততই ব্যথায় মুষড়ে পড়ছে। দু'চোখে পানি আজ বাঁধভাঙা স্রোতের মত হু হু করে নেমে আসছে। অথৈ সাগরে ভেসে চলেছে ওরা। মনিরা মামীমার চুলে হাত বুলিয়ে নীরবে কাঁদছিল।

হঠাৎ কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করতেই চমকে মুখ তুলল মনিরা। এতো দুঃখ আর ব্যথার মধ্যেও চোখ দুটো তার উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল— এসেছ। এতোক্ষণে এসেছ তুমি...বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো মনিরার কণ্ঠ।

দস্যু বনহুররের চোখে আজ অশ্রু। একটু পূর্বে বনহুরই শব্দবিহীন গাড়ি নিয়ে চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশ করেছিল।

মনিরার কথায় কোন জবাব দিতে পারে না, বনহুর। শুধু ঠোঁট দু'খানা একটু কেঁপে উঠে।

মনিরা ডাকে—মামীমা উঠো, দেখ কে এসেছে!

মরিয়ম বেগম তন্দ্রাচ্ছন্নভাব মুহূর্তে ছুটে যায়। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকান তিনি।

মনিরকে এখন চিনতে তাঁর দেরী হয় না। কারণ, ইতোপূর্বে মাতা-পুত্রের মিলন ঘটেছিল।

মরিয়ম বেগম পুত্রের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠেন। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন— ওরে আজ তুই এলি? তোর আব্বা যে আর এ দুনিয়ায় নেই। কাকে দেখতে এলি তুই! ওরে কাকে দেখতে এলি......

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে বনহুর—আম্মা!

মনির, তোর আব্বার তুই যে ছিলি নয়নের মনি। হৃদয়ের ধন ......

আম্মা আমি পারলাম না তাঁর একটু সেবা করতে, আমার জন্য তিনি জীবনে শুধু অশান্তিই ভোগ করে গেলেন। আমি তাঁর কিছু করতে পারলাম না আম্মা, আব্বার আত্মা আমাকে অভিসম্পাত করবে চিরদিন, আমি সে অভিসম্পাত আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবো......

না না, তোকে তিনি অভিসম্পাত করতে পারবেন না। তিনি যে তোকে বড় ভালবাসতেন! ওরে, তিনি যে তোকে বড় ভালবাসতেন!

আম্মা!

Generated by CamScanner from intsig.com

বনহুর হঠাৎ চমকে উঠে।

মনিরাও সচকিত হয়ে বলে উঠে—এতোরাতে কারা এলো?

দরজার পাশে গিয়ে সিঁড়ির দিকে উঁকি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বলে– মনির, পুলিশ।

মরিয়ম বেগম হতভম্বের মত বলেন—পুলিশ!

বনহুর একবার মা আর মনিরার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিছনের জানালা পথে পাইপ বেয়ে নেমে যায় নিচে।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ হারুন ও রায়, সঙ্গে মিঃ জাফরী। পিছনে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ।

মিঃ হারুন বিনীত কণ্ঠে বলে উঠেন— মাফ করবেন, যদিও আপনারা আজ অত্যন্ত শোকাতুরা তবু আপনাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। এখানে আপনার পুত্র দস্যু বনহুর এসেছে। বলুন সে কোথায়?

জবাব দেয় মনিরা—এসেছিল, কিন্তু এখন নেই।

মিস মনিরা অযথা মিথ্যা বলে...

না, আমি মিথ্যা বলিনি। .... আপনার আমাদের সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখতে পারেন।

মিঃ জাফরী পুলিশদের লক্ষ্য করে বলেন—তোমরা খুঁজে দেখো। তারপর মরিয়ম বেগমকে লক্ষ করে বলেন—দেখুন মিসেস চৌধুরী, আপনি আজ শোকাতুরা, আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের মোটেই উচিত নয়। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত করতে হচ্ছে। আপনার স্বামী এবং আপনি অতি মহান এবং মহৎজন, এ কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আপনাদের পুত্র দস্যু বনহুর অতি জঘন্য....।

না, সে জঘন্য নয়, ফুলের মত নিষ্পাপ। মরিয়ম বেগম দ্বীপ্ত কণ্ঠে কথাটা বলেন?

মিঃ জাফরী হেসে উঠেন– মায়ের কাছে সন্তান ফুলের মতোই নিষ্পাপ হয়। মিসেস্ চৌধুরী—দস্যু বনহুর শুধু ডাকু নয়, সে নর হত্যাকারী।

না না, আমার মনির নরহত্যা করতে পারে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। না না, কিছুতেই না–

অসম্ভব! ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনি দস্যু বনহুরের নাম শুনেছেন। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে পুলিশের ডায়েরী থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু দস্যু বনহুরের অপর দিকটা কি তা হয়ত এখনও আপনার জানা হয় নি। কিন্তু সে হতে পারে—নরহত্যাও সে করতে পারে, কিন্তু তাই বলে সে এতোখানি হীন নয় যে, তার পিতাকে হত্যা করে তার ঐশ্বর্য হস্তগত করবে।

মিস্ মনিরা আপনি জানেন—চোর ডাকু কোনদিন সৎ বা মহৎ হতে পারে না। অর্থের লোভে তারা সব পারে।

না, সে লোভী নয়। পিতার ঐশ্বর্য তো দূরের কথা, সে কারও ঐশ্বর্য চায় না।

হেসে উঠেন মিঃ হারুন—তাহলে সে দস্যুবৃত্তি করে কেন?

সেটা তার নেশা— পেশা নয়। অর্থের লোভে বনহুর কোন নরহত্যা করে না।

কিন্তু তার ভাল দিকটা একবারও ভেবে দেখবেন না? ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনি এরি মধ্যে ভুলে গেছেন দেশবাসীর প্রতি তার কত বড় আত্মত্যাগ! কিছুদিন পূর্বে বিদেশীর কবলে দেশ যখন মুহূর্মুহু আশঙ্কায় আশঙ্কিত, তখন দস্যু বনহুর কি আপনাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো না?

ছিলো! এ দেশ রক্ষা না হলে তারও যে বিপদ ছিলো এ– ও ঠিক।

না, তার বিপদ এখনও যেমন, ঠিক তখনও তেমন থাকত। শুধু মাতৃভূমির আকুল আহ্বানে সে সাড়া না দিয়ে পারেনি। ছুটে গিয়েছিল সে রণাঙ্গনে প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে, সে দেশ আর

Generated by CamScanner from intsig.com

দেশবাসীকে করেছিল রক্ষা। আজ প্রতিটি দেশবাসীর কর্তব্য দস্যু বনহুরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

মিঃ জাফরী গর্জন করে উঠেন—মিঃ হারুন, একেও এরেস্ট করা দরকার। কেন এতক্ষণ আপনারা একে মুক্ত করে রেখেছেন?

মিঃ হারুন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন– উত্তেজনার বশে এসব বলছে স্যার। আসলে এদের কোন দোষ নেই। চৌধুরী সাহেব অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। ওনার স্ত্রী মিসেস চৌধুরীও তেমনি অতি ভদ্র এবং নম্র। এ মেয়েটি অবশ্য একটু উগ্র স্বভাব, কিন্তু আসলে কিছু নয়। আমাদের অন্যভাবে এসব অনুসন্ধান নিতে হবে..।

ওদিকে পুলিশগণ সমস্ত কক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরে এলো—না স্যার, কোথাও কেউ নেই।

মিঃ হারুন নিজেও একবার খুঁজে দেখলেন, কিন্তু তাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হল।

মিঃ জাফরী কিন্তু মনে মনে ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন, গর্জন করে বললেন– অযথা আপনি না জেনে এভাবে এলেন কেন?

না স্যার, দস্যু বনহুর যে এখানে এসেছিল এ কথা সত্য। কারণ গেটের বাইরে যে গাড়িখানা আমরা দেখলাম, সেটাই দস্যু বনহুরের গাড়ি এবং বন্দী দারোয়ান যা বলল তাতেও ঐ কথাই বুঝা যায়।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন ও পুলিশগণ মিলে যখন ফিরে চললেন, তখন ভোরের আলোতে পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

❑

পুলিশ অফিসে পাশাপাশি বসে আলাপ করছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

মিঃ হারুন বলেন—স্যার, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের পূর্বে আমাদের কর্তব্য চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদঘাটন করা।

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছাও তাই। আপনি এ ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু করুন। কেসটা অত্যন্ত জটিল এবং ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে।

ইয়েস স্যার, চৌধুরী সাহেবের হত্যার পিছনে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

সে রহস্যই উদঘাটন করতে হবে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন ভগবৎ সিং।

মিঃ হারুন ভগবৎ সিংকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। যতক্ষণ না আসল খুনী ধরা পড়ছে ততক্ষণ তো কারো উপরে অসৎ ব্যবহার করা চলে না।

হ্যাণ্ডশেক করার জন্য মিঃ জাফরীর দিকে হাত বাড়ালেন ভগবৎ সিং।

মিঃ জাফরী হাত তুলে একটু আদাব জানালেন মাত্র।

ভগবৎ সিং আসন গ্রহণ করে বলেন—দেখুন ইন্সপেক্টার সাহেব, কাল থেকে আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই। কারণ, চৌধুরী সাহেব আমার বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন। একটু থেমে পুনরায় বলেন—যতক্ষণ না এ হত্যারহস্য প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ আমার এ অশান্তি যাবে না।

মিঃ হারুনই জবাব দেন—আমরা হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা নিচ্ছি।

Generated by CamScanner from intsig.com

মাথা চুলকে বলেন ভগবৎ সিং—ভয় হয় আমার ঘাড়ে না আবার কোন দোষ চেপে বসে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সিং বাহাদুর। আমরা নির্দোষীর ঘাড়ে কোন সময় দোষ চাপাবো না। মিঃ হারুন মৃদু হেসে কথাটা বলেন।

মিঃ জাফরী গভীর কণ্ঠে বলে উঠেন—আপনার বাড়িতে যখন হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে, তখন আপনাকে একটু কষ্ট ভোগ করতে হবে বৈকি। তাছাড়া যতক্ষণ আসল হত্যাকারী আবিষ্কার না হবে ততক্ষণ আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পারছেন না।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সত্যিকার বলছি ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি এ হত্যার ব্যাপারে একেবারে কিছুই জানি না।

মিঃ হারুন বলে উঠলেন—না না, আপনি তেমন লোক নন। আপনার মহৎ ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

হেঁ হেঁ, আপনারাই তো আমার আপন জন। আমার ঘরের খবর পর্যন্ত আপনারা জানেন।

মিঃ হারুন মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন– স্যার, এনার কথা একেবারে সত্য। ইনি আজীবন অবিবাহিত। বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক নেই। তাছাড়া ইনি বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেশেনও কম। দু'চারজন চাকর-বাকর ছাড়া....

এসব আমি এখন শুনতে চাইনি মিঃ হারুন। আচ্ছা সিং বাহাদুর আপনি এখন আসুন। গম্ভীর গলায় বলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন একটু বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু তাঁর উপরওয়ালার কথায় তো কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। কাজেই নীরব রইলেন।

ভগবৎ সিং উঠে দাঁড়ালেন—আমি তাহলে চলি। নমস্কার। বেরিয়ে যান ভগবৎ সিং।

ভগবৎ সিং বেরিয়ে যেতে মিঃ জাফরী বলেন—দেখুন মিঃ হারুন, আপনি তাকে যতখানি মহৎ এবং ভদ্র বলে মনে করছেন, ঠিক ততখানি নাও হতে পারে। একটু থেমে পুনরায় বলেন—ভগবৎ সিং এর উপর কড়া নজর রাখবেন। লোকটার ব্যবহার যদিও মন্দ নয়, তবু আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। হয়তো আমার এ সন্দেহ মনের এক ভ্রম, তাও হতে পারে। যাক্, এবার শুনুন, এখন আমরা কিভাবে কাজে নামবো এ নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

ইয়েস্ স্যার। কিন্তু আমাদের এ আলোচনার সময় মিঃ রায় এবং মিঃ আলমের সেখানে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। সন্ধ্যার পূর্বে আমরা অফিস-রুমে আলোচনা বৈঠকে বসব। আপনি মিঃ শঙ্কর রাও এবং আলমকে জানিয়ে দিন।

আচ্ছা স্যার, দিচ্ছি!

তখনকার মত মিঃ জাফরী উঠে পড়েন।

মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

মিঃ হারুন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরীকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

ডাকবাংলোয় মিঃ জাফরীর অফিস রুম।

চৌধুরী সাহেবের হত্যা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিল। মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আরও ছিলেন মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম।

আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ কেসের দায়িত্বভার মিঃ জাফরী নিজে গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে থাকবেন মিঃ হারুনও আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। আর রয়েছেন মিঃ রাও এবং মিঃ

Generated by CamScanner from intsig.com

আলম, এরা চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশকে সহায়তা করবেন।

মিঃ আলম অবশ্য পুলিশ ডিটেকটি নন। তিনি সখের গোয়েন্দা। সখ করে তিনি এসেছেন এ কাজে। ধনবান জাকারিয়া সাহেবের একমাত্র সন্তান তিনি।

শহরে বিরাট বাড়ি-গাড়ি সব আছে তাঁর। কাজেই এসব ব্যাপারে তার কোনই অসুবিধা হবে না।

সবাই যখন এই হত্যারহস্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন মিঃ আলম একপাশে নিশ্চুপ বসে বসে তাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। সকলের মুখোভার প্রসন্ন হলেও মিঃ আলমের মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর এবং ভাবাপন্ন। চৌধুরী সাহেবের হত্যা-ব্যাপার নিয়েই তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন।

সেদিনের মত আলোচনা শেষ হয়।

বিদায় গ্রহণ করেন মিঃ আলম এবং শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন এবং পুলিশ অফিসার দু'জনও সেদিনের মত মিঃ জাফরীর নিকটে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য নিয়ে জোর তদন্ত শুরু হল। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন প্রকাশ্য অনুসন্ধান করে চালালেন। মিঃ শঙ্কর রাও আর মিঃ আলম গোপনে অনুসন্ধান করে চললেন।

সেদিন পার্টিতে চৌধুরী সাহেবের টেবিলে বসে কে কে খাচ্ছিলেন, এটা নিয়েও গভীরভাবে আলোচনা চলল। সেদিন তাঁর টেবিলে ছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, খান বাহাদুর হালিম সাহেব, ডাঃ জয়ন্ত সেন এবং মিঃ আলম।

মিঃ জাফরীর ধারণা এ ক'জনার মধ্যে যে কোন একজন চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কে সে ব্যক্তি এবং কি তার উদ্দেশ্য?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ খুঁজে পেল না।

পুলিশ মহলে যখন চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে তখন একদিন...

গভীর রাত!

ডাক্তার জয়ন্ত সেন নিজের কক্ষে শুয়ে ছটফট করছেন। মনে যেন এতটুকু শান্তি পাচ্ছেন না! একবার উঠছেন একবার বসছেন আবার দরজা খুলে ছাদে গিয়ে পায়চারি করছেন।

অন্ধকার রাত। খোলা ছাদে রেলিং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ান জয়ন্ত সেন। হঠাৎ পিঠে একটা ঠাণ্ডা শক্ত জিনিসের স্পর্শ অনুভব করলেন।

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখতেই ডাক্তার সেনের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে এলো।

দেখলেন অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পিছনে—হাতে রিভলভার।

ছায়ামূর্তি চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল— চিৎকার কর না।

তুমি কে?

আমি যমদূত।

কি চাও তুমি আমার কাছে?

তোমার জীবন।

এ্যাঁ, কি বলছ? টাকা নেবে? যত টাকা চাও দেব।

ছায়ামূর্তি কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠে— যম কোনো দিন টাকার লোভী নয়। শয়তান, অনেক দিন পূর্বেই আমি তোমাকে খতম করতে পারতাম, কিন্তু করিনি— এটা তোমার বরাৎ। আজ আর

Generated by CamScanner from intsig.com

তুমি আমার হাতে রক্ষা পাবে না।

কেন, কি করেছি আমি তোমার?

একজন মহৎ ব্যক্তিকে তুমি হত্যা করেছ।

না না আমি কাউকে হত্যা করিনি...

ছায়ামূর্তি জয়ন্ত সেনের গলায় চেপে ধরেন— তুমি চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ দাওনি?

আমি— আমি নাতো। এসব তুমি কি বলছ?

ন্যাকামি করো না। শীঘ্র বল কোন সময় তুমি তার খাবারে বিষ দিয়েছিলে? সাবধান, মিথ্যা বল না।

ডাক্তার জয়ন্ত সেনের চোখ ছানাবড়া হয়। মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। একবার ছায়ামূর্তির দক্ষিণ হস্তস্থিত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বলেন— আমার কোন দোষ নেই. ঐ-ঐ ভগবৎ সিং বিষ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল আমাকে।

তাই তুমি একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে? উঃ, এত বড় পাষণ্ড তুমি! পরক্ষণেই ছায়ামূর্তি ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে ভূতলশায়ী করে টুটি টিপে ধরল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। ডাক্তার সেনের কণ্ঠ দিয়ে একরকম গড় গড় শব্দ বেরিয়ে এলো। চোখ দুটো ডিমের মত গোলাকার হয়ে উঠল। জিভটা ঝুলে পড়ল এক পাশে। শরীরটা বার দুই ঝাকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি পাশে রাখা রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল নিচে।

হঠাৎ জয়ন্ত সেনের দারোয়ান ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল— চোর, চোর! কিন্তু ছায়ামূর্তি তখন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে।

❑

রাত শেষ প্রহর।

গোটা রাত অনিদ্রার পর ভগবৎ সিং কেবলমাত্র চাদরটা চোখেমুখে টেনে নিয়ে সুখনিদ্রার আয়োজন করছিলেন। এমন সময় জানালার শার্সী খুলে কক্ষমধ্যে লাফিয়ে পড়ল পূর্বের সেই ছায়ামূর্তি।

ভগবৎ সিং বদ্ধ কক্ষে অকস্মাৎ শব্দ পেয়ে চাদর সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেন। ততক্ষণে ছায়ামূর্তি তাঁর নিকটে পৌছে গেছে।

ভগবৎ সিং চিৎকার করবার পূর্বেই একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বের করে তাঁর বুকে চেপে ধরে ছায়ামূর্তি, তারপর চাপা গর্জন করে উঠে— খবরদার! চেঁচাবে না।

ভগবৎ সিং একবার বক্ষসংলগ্ন ছোরাখানার ডগায় তাকিয়ে তাকান ছায়ামূর্তির মুখে। কঠিন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠে তাঁর মুখটা। বাম পাশের ঠোঁটখানা উপরের দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বলেন- কে তুমি?

আজরাইল। তোমার জান নিতে এসেছি।

আমার জান নেবে তুমি? কেন, আমি তোমার কি অন্যায় করেছি?

যা করেছ, অতি জঘন্য।

Generated by CamScanner from intsig.com

ভগবৎ সিং কোনোদিন কারো অন্যায় করেনি বা করে না।

বিড়াল তপসী সেজে সকলের চোখে ধুলো দিলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারনি শয়তান। কেউ না চিনলেও আমি তোমায় চিনেছি। এবার আর তোমার নিস্তার নেই। তোমার জান আমি কবচ করে ছাড়বো।

কে- কে তুমি?

এই মুহূর্তে আমি কে টের পাবে। চৌধুরী সাহেবকে হত্যার পরিণতি কি এখনই বুঝতে পারবে শয়তান।

চৌধুরী হত্যার পরিণতি... না না, চৌধুরী হত্যা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

তুমি তাকে হত্যা করিয়েছ।

এ কথা তুমি কেমন করে জানলে?

সেদিনের পার্টিতে আমিও ছিলাম।

তুমি— তুমি ছিলে সেদিন আমার পার্টিতে..... কে তুমি?

ভগবৎ সিং- এর কথা শেষ হয় না, ছায়ামূর্তির হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হয় ভগবৎ সিং এর বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে বিছানার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন ভগবৎ সিং। দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল।

ছায়ামূর্তি একটানে ভগবৎ সিং-এর বুক থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে জানালাপথে অদৃশ্য হল।

ঠিক সেইক্ষণে ভগবৎ সিং-এর এক কর্মচারী ছুটে আসে সেখানে। সে দেখতে পায় একটি ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিশে গেল। বিছানায় তাকিয়ে চক্ষুস্থির, একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সে- খুন- খুন-

পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো গোটা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। এক রাতে জোড়া খুন। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের অদ্ভুত মৃত্যু এবং বণিক ভগবৎ সিং এর রহস্যময় হত্যা- কিন্তু এ খুন করল কে?

পরবর্তী বই

ছায়ামূর্তি

Generated by CamScanner from intsig.com